প্রেতের আহ্বান

প্রসাদ উপাধ্যায়



প্রাপ্তিস্থান : 'সংকেত-ভবন', ৩, শম্ভুনাথ
পণ্ডিত ষ্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

'সাহিত্যিকা'র পক্ষে ১২৩, আম্‌হার্স্ট্‌ স্ট্রীট, কলকাতা
থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

দাম দু টাকা

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র



৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতার 'রংমশাল প্রেস
লিমিটেড' থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

এই সিরিজের অন্য বই

প্রবোধ ঘোষ

এখানে মৃত্যুর হাওয়া

কামাক্ষীপ্রসাদ

শ্বেত-চক্র

কালপুরুষ

বাস্তববাদ আমাদের কল্পনাকে এতোই পঙ্গু করেছে যে ইস্কুল কলেজ আপিস দোকান কাছারি বস্তি ফ্যাক্টরি আর পাড়াগাঁর বাইরে আমাদের দৃষ্টি চলে না। কিন্তু বহির্জগতের জীবন-অভিযান রোমাঞ্চে ভরপূর! মানুষের পৃথিবীতে এক অদৃশ্য শক্তি আছে, কখন যে তার আঘাত নামে, কখন যে কালপুরুষের অভিশাপ আসে তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। অসাধারণ মুহূর্তে তখন ঘটে নিষ্ঠুর মৃত্যু, নির্মম অপরাধ। সেই কালপুরুষের অভিশাপই এই সিরিজের বইগুলির বিষয়বস্তু।

বর্তমান য়ুরোপে অপরাধ রহস্য ও রোমাঞ্চ অপূর্ব সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে এসেছে বিস্ময়কর কৌশল। শেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ করে চেষ্টারটন্ পর্যন্ত অনেক নামকরা ইংরেজী সাহিত্যিকই কালপুরুষের ছায়ায় তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা সৃষ্টি করেছেন: রাশিয়ায় ডষ্টয়েভস্কি, আমেরিকায় অ্যালান্ পো। বাংলায় খাঁটি রোমাঞ্চ-সাহিত্য গড়ে তোলাই হচ্ছে কালপুরুষ সিরিজের উদ্দেশ্য।



৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কিশোর-কিশোরীদের শ্রেষ্ঠ সচিত্র পত্রিকা

সম্পাদক :

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বার্ষিক ৩৷৹

প্রতি সংখ্যা ।৶৹

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছুটি মানে একদম ছুটি

"ছুটি মানে একদম ছুটি"—কুনু বলল। অত্যন্ত ঢিলেঢালা গলা। ডেকচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে, পা-তুটো সামনের নীচু মোড়ায় তোলা। কাঁধের তলায় পাতলা বালিস, চোখতুটো খোলা না বোজা বোঝবার জো নেই। সামান্য ডেকচেয়ারে কতখানি আরাম করে শোয়া যায় তার যেন একটা চরম দৃষ্টান্ত। গরম পাতলা চাদরটা কোমর পর্যন্ত টানা, তার উপর শীতের রোদ পোষা কুকুরের মতো লুটোচ্ছে। পাশে ছোট্ট টি-পয়; তার ওপর একগাদা দেশী-বিলিতি পত্রিকা। কিন্তু কুনুর ভাবগতিক দেখলে মনে হয় না যে পত্রিকাগুলো তোল বার বা পাতা উলটে পড়বার উৎসাহ আছে। ছোট্ট দালান। তারপর বাগান। শীতের বাহারি ফুল। তারপর পিচের পথ; তারপর এবড়ো-খেবড়ো কালো পাথর আর তারপর সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় নীল জলে সোনালি রোদ চকচক করছে। যেন ইস্পাত।

দালানের অন্য প্রান্তে হালকা বেতের চেয়ারে বসে অশোক। ছিপছিপে লম্বা শরীর, চোখতুটো এমনিতেই জ্বলজ্বল করে। চওড়া কপাল; হালকা চুল; চুলগুলো উল্টোদিকে ঠেলে দেওয়া।

সমস্ত চেহারায় নির্মল বুদ্ধির ছাপ। তার সামনে বেতের টেবিল, তার উপর চামড়ার একটা ছোট বাক্স। ইস্পাতের কুঁচোকাঁচা যন্ত্রপাতি আর ওষুধের ছোট বড় শিশিতে বাক্সটা বোঝাই। টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ে অশোক সেগুলো পরিষ্কার করছিল। দু-একটা যন্ত্রপাতি বের করে শ্যাময় চামড়া দিয়ে ঘসছিল, ওষুধের দু-একটা শিশি বের করে আলোয় তুলে দেখছিল। কুনুর কথা শুনে অশোক অত্যন্ত শান্তভাবে মুখ তুলল, কুনুর দিকে স্থিরভাবে রইল চেয়ে। কুনু আবার বলল, এবার একটু বেপরোয়া ভাবেই, "ছুটি মানে একদম ছুটি।"

অশোকের চোখমুখে হাসির হালকা ছায়া খেলে গেল। "আর একদম ছুটি মানে?"

কিন্তু কুনুর শরীরে একটুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তেমনি আধবোজা চোখ; তেমনি নিস্পৃহ গলা, "একদম ছুটি মানে একদম ছুটি! চিৎ হয়ে হাই তুলব, যখন খুশি ঘুমোবো, যখন খুশি খাবো। আবার চোখ বন্ধ করব, আবার ঘুমোবো, আবার হাই তুলবো।"

"তার মানে ঘুমোতে ঘুমোতে হাই তুলবি না হাই তুলে তারপর ঘুমুবি?"

"তা ইচ্ছে হলে ঘুমুতে-ঘুমুতেও হাই তুলবো বইকি!"

"আর ইচ্ছে না হলে?"

"না হলে তুলবো না।"

"বেশ, বেশ। তার মানে এক কথায়, সুখে থাকতে চাস। কী বল ?"

"তা চাই। কিন্তু সুখ কি সইবে ?"

"কেন ? কী হল ?"

"তোর ওই ব্যাগটা ? ও বিভীষিকাটাকে সঙ্গে না আনলেই পারতিস।"

"কেন, ব্যাগটা আবার তোর পাকাধানে কী মই দিল ? তুই যদি ঘুমোতে-ঘুমোতে হাই তুলিস তা হলে ব্যাগটা নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।"

"ব্যাগ ছেড়ে ব্যাগের মালিকও আপত্তি করলে শুনছি না।"

"তা হলে ?"

"তবু তোর ওই ব্যাগটা দেখলে আতঙ্ক হয়, ঘুমুতে ঘুমুতে হাই তোলা দূরের কথা, ঘুমই চটে যায়। এখুনি হয়ত কোনো দুর্মুখ এসে খবর দেবে কোথায় চুরি হয়েছে বা কার দামী জহরৎ উধাও হয়েছে আর অমনি তোর চেহারাটা বদলে যাবে ; ওই ব্যাগ বগলে পুরে বলবি, 'কুনু, দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নে'।"

"তা ব্যাগটা কী অপরাধ করল ?"

"ওটাই ত তোর মাথার পোকা, তোকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে ! সময় নেই অসময় নেই, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, এখানে ওখানে যেখানে সেখানে তোকে ঘোড়দৌড় করাচ্ছে। আর, তোর অনিবার্য ল্যাণ্ড-বোট হিসেবে আমাকেও হচ্ছে ছুটতে।"

অশোক হাসতে লাগল। "এ কথা অবশ্য ঠিকই যে ব্যাগটা না থাকলে তদন্তের কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। বহুদিন ধরে বহু চেষ্টা করে একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগে তদন্তের পক্ষে প্রায় সমস্ত দরকারী জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে পেরেছি। কিন্তু তবু, তদন্তের জন্যেই ব্যাগ, ব্যাগের জন্যে ত আর তদন্ত নয়! মিছিমিছি ব্যাগ-বেচারার ওপর চটে লাভ কি বল?"

"সেই দৈত্যর গল্পটা মনে আছে?—সেই একটা লোক একটা দৈত্য তৈরি করেছিলো। তারপর, তৈরি করবার পর, দৈত্যটা চাইল সেই লোকটাকেই জলযোগ করে সেরে ফেলতে। তোরও হয়েছে তাই, ব্যাগটাই এখন তোর মাথা খাচ্ছে। ওটা দেখলেই তোর মনের মধ্যেটা চুলকোতে থাকে, শান্তিতে এক মুহূর্ত ছুটি ভোগ করতে পারিস নে। কোথায় চোর, কোথায় ছ্যাঁচোড়—তাদের জন্যে মন কেমন স্নুরু করে। আরে বাবা..."

কুন্থু হয়ত বক্তৃতাটা আরও খানিকক্ষণ চালাতো। কিন্তু অশোকের দিদি, যাঁর বোম্বাই-এর বাড়িতে ওরা দুজন বেড়াতে এসেছে, দালানে উপস্থিত হলেন, এবং তাঁর পেছন-পেছন ভৃত্য; ভৃত্যের হাতে প্রকাণ্ড ট্রে, নানারকম খাবার, চায়ের সরঞ্জাম এবং খবরের কাগজ ট্রের ওপর। খাবার-দাবার দেখে কুন্থুর মধ্যে এতক্ষণ পরে সত্যিকারের উৎসাহ দেখা দিল। ডেক-চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসল, পাশের টি-পয় থেকে ধপাস

করে মাসিক-পত্রিকাগুলো মেঝেয় ফেলে দিল। চাকর ট্রে-টা নামিয়ে রাখল টি-পয়ের উপর, দিদি একটা বেতের চেয়ার টেনে হাসতে হাসতে বসে পড়লেন। চাকর চলে যাচ্ছিল, কুনুর ডাকে ফিরে দাঁড়াল। গম্ভীরভাবে খবরের কাগজটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে কুনু বলল, "এটা নিয়ে যাও।"

চাকর অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে, এ নিয়ে আমি কী করব?"

কুনু বলল, "উনুন ধরাবে।"

চাকর আরও অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে এ যে আজকের কাগজ!"

দিদি কুনুকে চেনেন, কিন্তু তার এ ধরনের ব্যাপার দেখে একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন, "কাগজটার ওপর হঠাৎ এত রাগ হল কেন?"

কুনু বলল, "ও এক অতি সর্বনেশে ব্যাপার। কোথায় এক কোনায় হয়ত কী খুন খারাপির খবর থাকবে, আর আপনার ভাইটি বলে বসবে—কুনু, দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে বেরুতে হবে। বুঝছেন না দিদি, এই যে ছুটি, এত কষ্ট করে বোম্বাই আসা, সব একেবারে মাঠে মারা যাবে। ছুটোছুটিই সার হবে।"

অশোক অনুনয়ের সুরে বলল, "দোহাই তোমার কুনু, ঘুমুতে ঘুমুতে তুমি যত খুশি হাই তোলো, আমার একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু সকালে চায়ের সঙ্গে কাগজ পড়তে না দিলে সত্যি আমার হজম হবে না।"

কুনু মাতব্বরী চালে বলল, "ও সব বদ নেশা ছাড়াই ভালো, কী বলেন দিদি ?"

দিদি হাসতে লাগলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে কার দিক যে নেওয়া যায় ঠিক করতে পারছিলেন না। চাকর ভ্যাবা-চ্যাকা-খাওয়া ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। অশোক এবার প্রায় কাকুতি মিনতি সুরু করল। অগত্যা কাগজটা তাকে দিতেই হল ; চাকর স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে চলে গেল।

অশোক ডুবল খবরের কাগজে। কুনু আর দিদি খাবার দাবারে মন দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের মধ্যে গল্প গুজব খুব জমে উঠলো। অশোকের ভগ্নীপতি ভবতোষবাবু বোম্বাইতে ওকালতি করেন। আপাতত একটা মামলার ব্যাপারে পুনা গিয়েছেন দিনকতকের জন্যে। দিদি যতবার বোম্বাই দেখতে বেরুবার কথা বলেন কুনু ততবারই আপত্তি করে জানায় ভবতোষবাবু ফিরলে একসঙ্গে সব বেরুনো যাবে। এটা যে তার আলস্যের ওজুহাত দিদি তা বোঝেন। কিন্তু কুনুর মতো চঞ্চল ছেলেকে আলসেমি করতে দেখে তাঁর বেশ মজাই লাগে। তাই রোজ সকালে ইচ্ছে করে কথাটা তোলেন।

আজকেও সেই কথা হচ্ছিল। দিদি বলছিলেন, "না ভাই, তোমার চেয়ে অশোকই দেখছি ছেলে ভালো। এ কদিন ত তুমি শুধু আলসেমি করেই কাটালে, কিন্তু অশোক ইতিমধ্যেই সমস্ত সহরটা চষে ফেলেছে।"

কুন্থু আড়চোখে অশোকের দিকে চাইল, প্রশংসা শুনে মুখের ভাবটা কী রকম হয়েছে দেখবার জন্যে। কিন্তু চেয়েই কুন্থু চমকে উঠল। যা ভয় পেয়েছিলো ঠিক তাই! কাগজ পড়তে পড়তে অশোকের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে, চোখ মুখ একটু গম্ভীর, একটু থমথমে। অশোকের এ-চেহারার মানে কুন্থু বোঝে, তাই ঘাঁটাতে সাহস করে না। দিদিও অশোকের দিকে একবার দেখলেন। চোখে চোখে দিদির সঙ্গে কুন্থুর কী যেন কথা হয়ে গেল। তারপর দুজনেই আবার অন্য কথা পাড়ল।

চায়ের পেয়ালাটা টেবিলে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে অশোক আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কোন এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে ওর দেহমন যেন উত্তেজনায় টান-টান হয়ে উঠেছে: তারপর দালানের একোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত পায়চারি করতে স্থরু করল। কুন্থু বলল, "দিদি, লক্ষণ বড় খারাপ মনে হচ্ছে।"

যত উত্তেজিতই হোক না কেন, অশোকের কান সজাগ থাকে। কন্থুর কথা শুনে পায়চারি থামিয়ে দাঁড়াল, তারপর হোহো করে হাসতে হাসতে একটা বেতের চেয়ার কাছে টেনে বসে পড়ল। কুন্থু বলল, "তোর ভাবগতিক ত ভালো বলে মনে হচ্ছে না! দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে নাকি?"

অশোক হাসতে হাসতে বলল, "না না। আমাদের এখন বেরুতে হবে না। তবে ভবতোষদা খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন বলে মনে হয়।"

"তার মানে ?" দিদি অবাক হয়ে বললেন, "ওঁর ত ফেরবার কথা দিন সাতেক পরে! তাছাড়া, উনি ত আর এমন একটা কেউকেটা লোক নন যে তাঁর বম্বে ফেরার কথা কাগজে বেরুবে!"

অশোক বলল "তা অবশ্য বেরোয় নি।"

"তবে ?" দিদি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

অশোক নির্লিপ্ত ভাবে বলল, "কাগজে একটা ভূতের গল্প বেরিয়েছে।"

"ভূতের গল্প ?"

"হুঁ।"

"আর তার থেকেই তোমার মনে হল উনি আজই ফিরে আসবেন ?"

অশোক খুব জোর গলায় বলল, "নিশ্চয়ই।"

কুমু এবার প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠল, "হেঁয়ালী রাখ্। মনে হচ্ছে ছুটিটা মাঠে মারা গেল, ছুটোছুটি আবার করতেই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে বল।"

অশোক বলল, "বিশেষ কিছু নয়। এখানে 'উদয়-ভিলা' বলে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে দেখেছিস ?"

"দেখবো কেমন করে ?" কুমু বলল, "একদিনও ত হাঁটতে বেরুইনি।"

দিদি বললেন, "ও অবশ্য দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। সান্তা ক্রুস-এ। সমুদ্রের ঠিক ওপরে।"

"হুঁ," অশোক বলল, "সে বাড়ির মালিক প্রতাপচন্দ্র বাট্‌লি-ওয়ালা। কাগজে বেরিয়েছে যে উদয়-ভিলায় ভূতের উৎপাত সুরু হয়েছে এবং প্রতাপচন্দ্র বার কতক ভূতের সাক্ষাৎ পেয়ে এত ঘাবড়ে পড়েছেন যে তাঁর প্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।"

কুনু হো হো করে হেসে উঠল, "খবরটা বোধহয় উল্টো ছাপা হয়েছে। ভূত দেখে মাথা খারাপ হয়নি, মাথা খারপ হয়েছে বলেই ভূত দেখেছে! যাই হোক ভবতোষদা ত উকিল, ওঝা নন! ভূত তাড়াতে এখানে ছুটে আসবেন কেন?"

অশোককে এ কথার জবাব দিতে হল না। কেন না, কুনুর কথা শেষ হতে না হতেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ফটকের বাইরে—ধূলোয় বোঝাই গাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় অনেক দূর থেকে আসছে। তরে মধ্যে থেকে নামলেন ভবতোষবাবু। নাদুস-নুদুস মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাথা খারাপ আর মাথা ব্যথা

নাদুস-নাদুস ভুলো ভোলানাথের মতো চেহারা, ভবতোষ নামটা খুব খাপ খায়। হন্তদন্ত ভাবে হাতে হালকা ব্যাগ নিয়ে বাগান পেরিয়ে তরতর করে উঠে এলেন। অশোক আর কুনুকে একেবারে দালানে দেখতে পেয়ে মহা খুসি—"যাক, তোমরা বাড়িতেই আছ! বাঁচলুম। একটা ভয়ানক জরুরী কাজ পড়েছে। হঠাৎ তাই আমায় ফিরতে হল—"এক নিঃশ্বেসে বললেন এত-গুলো কথা, তারপর ধপাস করে একটা চেয়ারে পড়লেন বসে।

অশোকের দিদি এক পেয়ালা চা ঢালতে ঢালতে বললেন—"ওরা ত তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। অশোক বলছিলো খানিকক্ষণের মধ্যেই তুমি ফিরবে।"

ভবতোষবাবু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন—"কী আশ্চর্য! আমি ফিরব জানলো কেমন করে! আমার ত ফেরবার কথা দিন কতক পরে!"

অশোক হাসতে হাসতে বলল, "অবাক হবেন না। এর মধ্যে এমন কিছু বুদ্ধির কসরৎ নেই। উদয়-ভিলায় প্রতাপচন্দ্রের যদি মাথা খারাপ হয় তা হলে তা নিয়ে আপনারই' ত সবচেয়ে

বেশি মাথা ব্যথা হবার কথা। তিনি যে আপনার একজন প্রধান মক্কেল সে কথা ত আগেই একদিন বলেছিলেন।"

ভবতোষবাবুর চোখ এবার সত্যিই কপালে উঠল !

"কী আশ্চর্য ! প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপের খবরটা তোমরাও জেনে গেছ !"

এবার অবাক হবার পালা অশোকের। বলল, "খবরের কাগেজেই যখন খবরটা বেরিয়েছে তখন আর আমাদের পক্ষে জানাটা এমন কী বিস্ময়ের ?"

একেবারে চমকে উঠলেন ভবতোষবাবু। স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিতে যাচ্ছিলেন, পেয়ালা থেকে চা উপচে পড়ল পিরিচে। বললেন—"খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে !" ভবতোষবাবু বুঝি নিজেই ভূত দেখলেন। তারপর হতাশ ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল !"

অশোকের দিদি প্রশ্ন করলেন, "কেন, মাটি কী হল ?"

"মাটি নয় ?"—ভবতোষবাবু একটু উত্তেজিতভাবেই বললেন, "পাছে বেশি লোক-জানাজানি হয় সেই ভয়েই ত টেলিগ্রাম পেয়েই আমি ছুটে এসেছি।"

অশোকের কপাল একটু কুঁচকে উঠল, "কেন ? বেশি লোক-জানাজানি হলে মুস্কিলটা কী ?"

এতক্ষণ পরে কুমু কথা বলল, "ভারি গোয়েন্দা হয়েছিস ! মুস্কিলটা কি তাও বুঝিয়ে দিতে হবে ? তুই যদি আজ পাগলা

হয়ে যাস আর সবাই যদি তা জেনে ফেলে তা হলে তোর দুর্নাম হবে না? মক্কেলের দুর্নামটা মুস্কিলের নয়?"—খুব মাতব্বরী চালে বলল কুনু এবং অশোককে বুদ্ধিতে পর্যুদস্ত করার বীরদর্পে একবার দিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখল।

"না হে না!" ভবতোষবাবু যেন এক কথায় কুনুর সমস্ত উৎসাহ দুমড়ে দিলেন, "ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আসল কথা হল আইনের একটা হাঙ্গামা: প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে একথা সর্বত্র প্রমাণিত হলে ওই বিরাট সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। কেননা, সম্পত্তিটা তাঁর কাকা উদয়চন্দ্র তাঁকে উইল করে দিয়ে গেছেন এবং উইলে এই একটি-মাত্র সর্ত।"

"এ আবার কোন ধরনের উইল?" দিদি বললেন, "ভাইপোর যে মাথা খারাপ হতে পারে তাই বা কাকা অত আগে আঁচ করলেন কেমন করে?"

"সে একটা ভারি হাঙ্গামার ব্যাপার," ভবতোষবাবু বললেন, "ওঁদের বংশ সম্বন্ধে বরাবর একটা প্রবাদ আছে যে ওঁদের রক্তে রয়েছে পাগলের বিষ, যে কেউ যে কোনদিন পাগল হয়ে যেতে পারে।"

অশোকের মুখ গাম্ভীর্য্যে থমথম করছে, অত্যন্ত শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু এর আগে সত্যি-সত্যি কি কেউ পাগল হয়েছেন বলে জানা আছে?"

ভবতোষবাবু বললেন, "না। আমি খোঁজ করেছিলুম। কিন্তু সে রকম কারুর কথা শুনিনি। প্রবাদটা কেন যে আছে তা বলতে পারিনে ; তবে আছে যে এ কথা ঠিক। মরুক গে যাক প্রবাদ। কিন্তু কথা হল খবরের কাগজওয়ালারা ব্যাপারটা এমনভাবে টের পেলো কী করে!"

অশোক বললো, "হুঁ। সেটা সত্যিই ভালো করে ভেবে দেখতে হবে"—তারপর একটু হেসে, "হয়ত বোম্বাইএর কাগজ-ওয়ালারা খুব বেশি করিৎকর্মা লোক। সে যাই হোক, আপনি এখন চা-টা খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে আগাগোড়া শোনা যাবে।"

ভবতোষবাবু অত্যন্ত ব্যগ্র গলায় বললেন, "কিন্তু ভাই অশোক আর কুনু, এসব ব্যাপারের মধ্যে সত্যিই একটা কিছু গোলমাল আছে। আমার কপাল অত্যন্ত ভালো যে ঠিক এই সময়েই তোমরা এখানে এসে পড়েছো। ব্যাপারটার সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের নিতেই হবে।"

কুনু হতাশভাবে দীর্ঘ নিশ্বেস ফেলে বললো, "ওকে আর অনুরোধ করছেন কি! ক্যাওলা ভাত খাবি না পাত পাব কোথায়?—ওর সেই অবস্থা হয়েছে। মঘা যোগে চেপেছিলুম ট্রেনে, ছুটিটা শেষ পর্যন্ত ছুটোছুটিই হয়ে দাঁড়াবে। যাই হোক ভবতোষদা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন। শোনা যাক সব কথা। আমি যাব বঙ্গে আমার কপাল যাবে সঙ্গে।"

হাতমুখ ধুয়ে ভবতোষবাবু এসে বসলেন। অশোক বলল, "সমস্ত ব্যাপারটা বেশ খুঁটিয়ে আগাগোড়া বলে যান—" বলে চোখ বন্ধ করে একটা ডেকচেয়ারে নিজেকে ঢেলে দিল। ভবতোষবাবু বলে চললেন :

"প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে গোড়ায় দু'চারটে কথা বলি। ক্রোড়পতি উদয়চন্দ্র বাটলিওয়ালার ভাইপো, উদয়চন্দ্রের ছেলেমেয়ে না থাকায় প্রতাপচন্দ্রই এখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক। উইলে কেবল একটা সর্ত আছে, সে কথা ত আগেই বলেছি। প্রতাপচন্দ্র বহুদিন বিদেশে থেকে লেখাপড়া করেছেন; বিদ্বান লোক, শুধু বিদ্বান বললে কমিয়ে বলা হয়। কেন না লাইব্রেরিটা ছাড়া তাঁর জীবনে যেন আর কোন আকর্ষণ নেই। শান্ত স্থির বুদ্ধি, আর তেমনি মিষ্টি স্বভাব। যদিও তাঁদের বংশে পাগল হওয়া সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট প্রবাদ চলতি আছে তবুও প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে আমার এ দুর্ভাবনা কোনদিন ছিল না। কিন্তু হালে সেই দুর্ভাবনাই আমার সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে কেননা সত্যিই আমি নিজের চোখে দেখছি প্রতাপচন্দ্রের মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! এমনিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলো, কিছু টেরই পাবে না। যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর পাণ্ডিত্য উজোড় করেও তিনি ক্লান্ত হবেন না। কিন্তু ঠেকে যাবে একটা বিষয়ের কথা উঠলে : প্রেতলোকের কথা। দেখবে তিনি কী রকম গম্ভীর হয়ে যান এবং অত্যন্ত শান্ত গম্ভীর ভাবেই

তিনি এলোমেলো যা তা বকতে সুরু করবেন। এমন সব আজগুবি কথা যে শুনলে হাসি পায়, কিন্তু হাসা যায় না, কেন না তখন তাঁর সমস্ত চোখেমুখে ফুটে ওঠে একটা দুর্বল অসহায় আতঙ্ক। তখন মায়া হয়, দুঃখু হয়।”

“কী ধরনের কথা ?”—অশোক প্রশ্ন করল।

“সে সব ভারি আজগুবি কথা, একেবারে আষাঢ়ে গল্প। প্রেতলোক সম্বন্ধে নানান তথ্য বলে যাবেন, এমন কি বলতে সুরু করবেন গভীর রাতে তিনি নিজে প্রেতলোকের দর্শন পেয়েছেন। তিনি নিজে নাকি দেখেছেন একটা কাটা মুণ্ডু অন্ধকার ঘরে ভাসছে, উল্‌টো হয়ে ভাসছে এবং নরকের নীলচে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে সেই মুণ্ডু থেকে। কিম্বা, তিনি নাকি স্বচক্ষে দেখেছেন নরকের বিদ্‌ঘুটে পাখি মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে এবং তার গা থেকে নাকি ঠিকরে বেরুচ্ছে প্রেতলোকের অদ্ভুত আলো !”

অশোক শান্তভাবে বলল, “কিন্তু এতে হাসি পাবার কী আছে ? ভদ্রলোক ত সত্যিসত্যিই এসব দেখে থাকতে পারেন !”

“কী রকম !”—উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসল কুমু, “সত্যি দেখেছেন মানে ? তোর বংশেও মাঝেমাঝে উন্মাদের উদয় হয় নাকি ?”

“ঠিক জানিনা,” অশোক বলল, “সে রকম কোনো প্রবাদ থাকলেও অন্তত আমি কখনো শুনিনি। কিন্তু আসলে যা

শুনলুম তাতে পাগলামির কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অবশ্য মাথা খারাপ হলেও এসব জিনিস মানুষ দেখতে পারে ; কিন্তু প্রতাপচন্দ্র দেখেছেন বলেই যে তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে তা প্রমাণ হয় না।"

"প্রমাণ হয় না মানে ? সুস্থ মাথায় মানুষ এসব দেখবে কেমন করে ?"—কুমুর যেন রণং দেহি ভাব।

"ও সব জিনিস চোখে পড়লেই দেখতে পারে।"—অশোকের গলা নির্লিপ্ত, সহজ। "ধর, বাড়িটায় সত্যিই ভূত আছে।"

"তা যদি থাকে ত বেঁচে যাই। একবার বাড়িটায় গিয়ে ভূতের সঙ্গে কোলাকুলি করে আসি"—বলে হোহো করে হেসে উঠল কুমু।

কিন্তু কুমুর হাসি ডুবে গেল অশোকের হাসিতে—"ঠিক হয়েছে"—অশোক বলল—"মানে ভূত আছে কিনা একবার গিয়ে দেখতে তোর আপত্তি নেই। বরং উৎসাহই আছে। এই কথাটাই তোর মুখ দিয়ে বার করতে চাইছিলুম। কুমু, ঘুমুতে ঘুমুতে হাই তোলা সত্যি তোর কপালে নেই, মেজাজেও নেই। ছুটি মানে একদম ছুটি আর হল না!"

কুমু বেচারা একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ওর দুর্ভোগ দেখে দিদিও আর না হেসে থাকতে পারলেন না। কুমু আমতা-আমতা করে বলল, "কিন্তু সত্যিই কি তুই বলতে চাস বাড়িটায় ভূত থাকতে পারে!"

"তা এক্ষুনি কেমন করে বলি, বল! ওখানে গিয়ে ভাল করে সব খোঁজ-খবর করতে হবে, তাছাড়া, ভবতোষদার কাছ থেকে এখনো ত সমস্ত কথাই শোনা হয়নি। যাই হোক, তুই যখন আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় একাজে নামতে রাজি হয়েছিস তখন আর ভাবনা নেই।"—তারপর ভবতোষবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "বলুন এবার প্রতাপচন্দ্রের আগাগোড়া ইতিহাস।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরনো পুঁথি

অদ্ভুত ছেলে এই অশোক! বাস্তবিকই অদ্ভুত! এখন তার চেহারা দেখে কে অনুমান করবে মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে বন্ধুকে বুদ্ধির খেলায় পরাস্ত করাবর ছেলেমানুষি অনন্দে ও অমন উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। ভবতোষবাবুর কথা শোনবার সময় ওর চোখ-মুখের ভাব অতি-প্রবীণ, অতি-গম্ভীর মানুষের মতন; হালকা হাসির ধারকাছ দিয়েও যেন যেতে চায় না। বেতের টেব্‌লটার ওপর দুটো কনুই রেখেছে; বাঁ হাতের চেটোটা বন্ধ দুচোখের ওপর চাপা, ডান হাতের সরু-সরু দুটো অঙুল দিয়ে মাথার একগোছা চুল টেনে-টেনে ক্রমাগতই কপালের ওপর নামাচ্ছে। শরীরে আর কোথাও বিন্দুমাত্র কোন রকম চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই।

প্রতাপচন্দ্রের ইতিহাস ভবতোষবাবু আগাগোড়া বলে চললেন:

"উদয়চন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন প্রতাপচন্দ্র বিদেশে। কি একটা দর্শনিক বিষয় নিয়ে ফ্রান্সে গবেষণা করছেন 'ডাক্তার' উপাধির জন্যে। তাঁর কাকার মৃত্যু-সংবাদ আমিই তাঁকে কেবল্ করে জানাই এবং সেই সঙ্গে উদয়চন্দ্রের এ্যাটর্নি হিসেবে জানাই উইলের কথা। উদয়চন্দ্রের অগাধ বিষয় সম্পত্তি; নিজে এসে

দেখাশুনো না করলে নানান হাঙ্গামা বাধতে পারে এই জন্যে প্রতাপচন্দ্রকে অনুরোধ করি সঙ্গেসঙ্গে দেশে ফিরতে। কিন্তু লোকটি যাকে বলে একেবারে বৈরাগী; সম্পত্তি সম্বন্ধে অমন উদাসীন ভাব তোমরা ভাবতেও পার না। তাঁর লেখাপড়ার কাজ বিষয়-আশয়ের কাজের চেয়ে ঢের বেশি গুরুতর; ফলে তিনি অনুরোধ করলেন লক্ষ্ণৌতে তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই ধীরবিক্রমকে আপাতত বিষয়টিষয় দেখতে বলতে! অনেক হাঙ্গামা করে ধীরবিক্রমকে আবিষ্কার করলুম বটে, কিন্তু এক বৈরাগীর পাল্লা থেকে আর এক বৈরাগীর পাল্লায় পড়া গেল। সম্পত্তি নিয়ে এমন সাধাসাধি করার কথা আমি গল্পেও পড়ি নি। ধীরবিক্রম লক্ষ্ণৌ-এ থেকে লেখাপড়া করত, অর্থাৎ খেলাধূলো করত। কেন না, সহরে ওর নাম ছিলো পয়লা নম্বর হকি খেলোয়াড় বলে এবং কলেজের খাতায় ওর নাম ছিল নিছক খেলার খাতিরে। বাপের অবস্থা মন্দ নয়। ফলে, আজীবন ধীর ভাবে বসে কাটালেও পৈত্রিক টাকার কিছু বাকি থাকবে, তাই দিয়ে ঘটা করে শ্রাদ্ধ-শান্তি করা চলবে! তা হলে আর সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা কেন? তা ছাড়া, পরের টাকায় যখ হয়ে বসে পাহারা দেবার মতো বিড়ম্বনা আর নেই; কোথায় পান থেকে একটু চুণ খসবে আর তার জবাবদিহির হাত থেকে ইহলোকে যদিই বা পরিত্রাণ পাওয়া যায় পরলোকে কোনমতেই পাওয়া যাবে না। মহা বিপদ। রাজি কিছুতেই করাতে পারি নে। লিখলুম প্রতাপ-

চন্দ্রকে। তিনি আবার লিখলেন ধীরবিক্রমকে। আমি আবার দেখা করলুম ধীরবিক্রমের সঙ্গে। এই রকম ভাবে কাটল মাস কতক। মনে হল তুটি একেবারে খাস পাগলের পাল্লায় পড়া গিয়েছে!"

"তা হলে," কুমু হাসতে-হাসতে বলল, "বংশে পাগলামির প্রবাদটা নেহাৎ বাজে কথা নয়।"

"হুঁ; পাগলামিই বই কি," ভবতোষবাবু বললেন, "এক ধরনের পাগলামি ছাড়া আর কি? তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, সম্পর্ক তুজনের মধ্যে যত দূরই হোক না কেন, মনের ঘনিষ্ঠতা একেবারে নিরেট।"

"তারপর কী হল?"—দিদি একটু অধৈর্যভাবেই প্রশ্ন করলেন।

"তারপর," ভবতোষবাবু আবার বলে চললেন, "সেই দূর সম্পর্কের ভাইটিকেই নিকটে আসতে হল। অর্থাৎ, ধীরবিক্রম শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদয়-ভবনে কিছুদিনের জন্যে এসে থাকতে রাজি হল। সর্ত হল প্রতাপচন্দ্র বিদেশ থেকে ফিরলেই ধীরবিক্রম ছুটি পাবে।

"প্রথমটায় ধীরবিক্রম যেমন ভয় পেয়েছিল এসে দেখল সে রকম কিছু নয়। বোম্বাইতেও রীতিমত হকি খেলার আদর আছে এবং জাঁকালো খেলোয়াড়েরও অভাব নেই। উদয়-ভবনের পথেই দিনকতকের মধ্যে দেখা গেল ধীরবিক্রম এক ডাকসাইটে

হকি-টিম তৈরি করে নিয়েছে; সান্তা ক্রুস্ অঞ্চলের যত ডানপিটে গোয়ানিস ছোকরা জুটেছে তার দলে আর ধীরবিক্রমের দক্ষতায় এক একটি তুখোড় খেলোয়াড় হয়ে উঠছে। মাঝে-মাঝে আমি বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে দেখা করতে যেতুম; কিন্তু এ সব কথা উঠলেই সে হাই তুলতে সুরু করত, হাত জোড় করে মিনতি করত ও-সব ব্যাপার থেকে রেহাই দিতে। তবুও, মনেমনে আমি খুব খুশিই ছিলুম; হাজার হোক, উদয়-ভবনে তবু একজন ত রয়েছে।"

অশোক এতক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, "কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না ভবতোষদা। প্রতাপচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন বলতে কি দুনিয়ায় আর কেউ নেই যে ধীরবিক্রমকে ছাড়া আর আপনাদের চলছিল না?"

ভবতোষবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ! ধীরবিক্রমই যাকে বলে সবেধন নীলমণি।"

"ও! তারপর?"—অশোক আর কথা বাড়াতে চাইল না।

"তারপর কিছুদিন কাটল নির্বিঘ্নে। প্রতাপচন্দ্র পড়াশুনো শেষ করে ফিরে এলেন এবং ধীরবিক্রম স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে পালাতে চাইল। প্রতাপচন্দ্র অনেক ভাবে আবেদন-নিবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু ধীরবিক্রম একেবারে অবুঝ। এই অগাধ টাকার মধ্যে বেশি দিন থাকা তার মতে মোটেই উচিত নয়, কেননা ছোঁয়াচ লাগতে পারে, নেশা ধরতে পারে—টাকার নেশা।"

"যাকে বলে একেবারে বৈরাগী !"—দিদি বললেন ।

"হুঁ ; একেবারে পাকা বৈরাগী," ভবতোষবাবু বলে চললেন, "যাই হোক, ধীরবিক্রম দিনকতকের মধ্যেই বিদায় নিল এবং প্রতাপচন্দ্র ডুবলেন উদয়-ভবনের বিরাট লাইব্রেরির মধ্যে। মাস-কতক বেশ নির্বিঘ্নেই কাটল ; আমিও যার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিতে পেরে এক রকম নিশ্চিন্তই ছিলুম। কিন্তু সুখ সইল না বেশি দিন। মাস কতক বাদেই দারুণ দুর্যোগ সুরু হল।"

"কী ধরণের দুর্যোগ ?"—অশোক প্রশ্ন করল।

"প্রথম লক্ষ্য করলুম প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। এমনিতেই একটু ভাবুক ধরনের লোক, দিনরাত পুঁথিপত্তর নিয়ে পড়ে থাকেন। অল্প বয়েসেই প্রকাণ্ড পণ্ডিত হিসেবে নাম করেছেন। বিষয়কর্মের কাজ নিয়ে তাঁর কাছে মাঝেমাঝে যেতেই হত এবং তাঁর লাইব্রেরিতেই বসে কথাবার্তা সব হত। নানান বিষয়ের দুর্বোধ্য পুঁথির স্তূপে তিনি যেন সব সময় চাপা থাকতেন। বৈষয়িক কথা যত কমের মধ্যে হয় সেরে নিয়ে বিদায় নিতুম। কিন্তু, সেদিন গিয়ে দেখি তাঁর চেহারা একেবারে অন্য রকম—"

"কতদিন আগেকার কথা বলছেন ?" অশোক প্রশ্ন করল।

"তা মাস আষ্টেক হবে বোধ হয়। দেখলুম তাঁর অবস্থা অত্যন্ত উত্তেজিত। আমায় চটপট বিদায় দেবারও কোন উৎসাহ দেখলুম না। একটু বসতে বললেন, চাকরকে বললেন চা দিয়ে

যেতে। সরঞ্জাম এলে নিজেই চা তৈরি করতে লাগালেন। কিন্তু চুপচাপ। কি যেন একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে পারছেন না। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি নিরুপায় ভাবে পাশের থেকে একটা বই তুলে নিলুম এবং চমকে উঠলুম। আজকাল বাজারে প্রেতলোক সম্বন্ধে যে রকম উদ্ভুট্টে গাঁজাখুরি বই ছড়ানো থাকে সেই জাতের একখানা বই! অতবড় গম্ভীর পণ্ডিত এ ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারেন তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। তারপর ভাবলুম, কোনমতে আর পাঁচটা বই-এর সঙ্গে এ বইটা হয়ত দৈবাৎ ছিটকে এসেছে। সেটা রেখে দিয়ে আর একটা বই তুলে নিলুম। দেখলুম একই জাতের বই। তারপর আর একটা, তারপর আর একটা। দেশি বিলিতি যত সব আজগুবি বই-এ তাঁর পড়ার টেবল্ বোঝাই হয়ে রয়েছে দেখলুম! বিস্ময়ে আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়! এত বড় পণ্ডিত কি না প্রেতলোক এবং পরলোক নিয়ে এই সব অপাঠ্য পুঁথিতে ঘর বোঝাই করেছেন এবং মনে হচ্ছে শুধু এই সব বই-ই আজকাল তিনি পড়ছেন। চমক ভাঙল প্রতাপচন্দ্রের কথায়, চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে-দিতে তিনি বলছেন—'চা নিন।' নিলুম চা। অবাক হয়ে চাইলুম তাঁর দিকে। দেখি এক অদ্ভুত ভীরু দুর্বল হাসি তাঁর ফ্যাকাশে ঠোঁটের পাশে।—'আজকাল শুধু এই সব বইই পড়ছি'—প্রতাপচন্দ্র যেন জোর করে হাসবার চেষ্টা করলেন—'আপনার অবাক লাগছে। না?'

" 'তা অবাক লাগবার ত কথাই', আমি বললুম,—'আপনার মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও যদি'—

"প্রতাপচন্দ্র বাধা দিলেন—'হুঁ। ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া লাগবার কথা বই কি। কিন্তু কি জানেন! আমি শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখতে চাই। জীবনে যখনই যা জানতে চেয়েছি শেষ পর্যন্ত জানবার চেষ্টা করেছি। অনেক কিছুই জেনেছি, অনেক কিছুই পড়েছি। কেবল প্রেতলোকের ব্যাপারটাই এতদিন অগ্রাহ্য করে এসেছি'—

" 'কিন্তু অগ্রাহ্য করবার মতোই নয় কি?'

" 'তাই ত মনে করতুম। এখন দেখছি প্রকাণ্ড ভুল করতুম।' প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন, চা দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিলেন তারপর প্রায় খাপছাড়া ভাবেই বললেন—'আমাদের বংশে একটা পাগল হয়ে যাবার প্রবাদ আছে জানেন নিশ্চয়ই।'

" 'হুঁ। শুনেছি বই কি। কিন্তু সে ত প্রবাদমাত্র; তার বেশি কিছু নয়।'

" 'আমারও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা এতদিনে আবিষ্কার করেছি।' আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। প্রতাপচন্দ্র বলে চললেন—'আসল ব্যাপারটা হল আমাদের বংশে এক বিষাক্ত অভিশাপ আছে। এক সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণের অভিশাপ! এই অভিশাপের দরুণ এক-পুরুষ অন্তর আমাদের বংশে উন্মাদের উদয় হয়। আমার ঠাকুরদাদা অবশ্য অল্প বয়েসে

মারা গিয়েছিলেন, তাই তিনি এ অভিশাপের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।'

" 'কিন্তু তাঁর ঠাকুর্দা ?'—আমি প্রশ্ন করলুম। প্রতাপচন্দ্র বললেন—'তাঁর ঠাকুর্দা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু শুনিনি। কার কাছেই বা শুনব বলুন ? জ্ঞান হবার পর দুজন আত্মীয়কে মাত্র দেখেছি, ধীরবিক্রম এ সব কিছু জানে না, জানতে চায়ও না। আর কাকা এ সব কথা নিশ্চয়ই জানতেন কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করতে কখনো রাজি ছিলেন না। আপনি ত জানেন কী অসম্ভব গম্ভীর ছিলেন তিনি !'

" 'তা অবশ্য জানি। কিন্তু কথা হল হঠাৎ আপনি এতদিন পরে এ সব তথ্য আবিষ্কার করলেন কেমন করে ?'

"প্রতাপচন্দ্র বললেন—'হঠাৎই ! কিছুদিন আগে লাইব্রেরির পুরনো পুঁথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা খাতা আবিষ্কার করেছি। অতি পুরনো ঝুরঝুরে খাতা সেই খাতাটায় আমাদের বংশের অভিশাপ সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবরণ লেখা আছে। লেখা আমার কোনো পূর্বপুরুষের, কার যে তা ঠিক জানি না। তবে অনেক পুরুষ আগেকার কেউ বলে মনে হচ্ছে।" '

ভবতোষবাবু বলে চললেন, "তারপর প্রতাপচন্দ্র অত্যন্ত শান্ত স্থির গলায় এমন সব অসম্ভব আজগুবি কথাবার্তা বলে যেতে লাগলেন যে বিস্ময়ে আমার হাতের চায়ে চুমুক দিতে একদম ভুলে গেলুম ; চা ঠাণ্ডা কনকনে হয়ে গেল। কথাগুলো

বিশ্বাস করেছিলুম বলে অবাক হই নি ; অবাক হলুম এমন সব অদ্ভুত কথায় তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন দেখে! মনে হল ছাই-পাঁশ কতকগুলো বই পড়ে-পড়ে তাঁর মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছে। তবু যে খাতাটা অত হাঙ্গামার মূলে সেটা আসলে কি তা জানতে চাইলুম। তিনি সেটা বের করে দিলেন। সত্যিই বহুকালের পুরনো খাতা এবং তাতে যে-ঘটনার কথা লেখা রয়েছে তা পড়তে-পড়তে সুস্থ মানুষের মাথাও গোলমাল হয়ে যায় বই কি।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূর্যপূজারীর অভিশাপ

অশোক বলল, "খাতাটা আপনার কাছে আছে না কি ?"

"হুঁ আছে", ভবতোষবাবু বললেন, "যত্ন করে লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছি। কিন্তু সে ত গুজরাটি ভাষায় লেখা বহু পুরনো ঝুরঝুরে একটা খাতা। সেটা দেখে কিছু বুঝতে পারা কঠিন। তবে আমি একজন গুজরাটি ভদ্দরলোককে দিয়ে ইংরিজিতে হুবহু তর্জমা করিয়েছি ; তর্জমাটা পড়ে মনে হয় শ দেড়েক বছর আগে উদয়চন্দ্রের কোনো পূর্বপুরুষ-এর লেখা।"

অশোক বলল, "তা হলে খাতাটা পরে দেবেন, একটু দেখব। আপাতত মোটামুটি বলুন তাতে কী ঘটনার কথা লেখা আছে।"

"বলছি", ভবতোষবাবু বললেন, "কিন্তু তার আগে বাটলি-ওয়ালা বংশের আদি বাড়ি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নওয়া দরকার। কেননা, খাতায় যে কথা লেখা আছে তার ঘটনাস্থল হল সেই পুরনো বাড়ি। সান্তা ক্রুসে সমুদ্রের ধারে উদয়-ভবন বলে একটা বাড়ি আছে দেখেছ বোধ হয়। সেটা কিন্তু ওঁদের আদি বাড়ি নয়। উদয়চন্দ্র সেটা তৈরি করেছেন। এই উদয়-ভবন ডানদিকে রেখে সমুদ্রের পাড় ধরে সোজা

এগিয়ে গেলে—অনেকদূর এগিয়ে গেলে—একেবারে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়বে। সেখানে চোখে পড়বে একটা ভাঙা বিরাট প্রাসাদ, সেটাই ছিল ওদের আদি বাড়ি। সমুদ্রের ঠিক কোলেই একটা ছোট পাহাড়মতো, এবং তার ওপর সেই বিরাট পোড়ো বাড়িটা ওদের বংশের অতীত ঐশ্বর্যের প্রেতের মতো আজও দাঁড়িয়ে আছে। ওই বাড়িটাতেই গত পঁচিশ বছর ওঁরা বংশ পরম্পরায় জীবন কাটিয়েছেন। মাত্র বছর পঁচিশ আগে উদয়ানন্দ সেটা ছেড়ে দিয়ে সান্তা ক্রুস-এর লোকালয়ে তাঁর উদয়-ভবন তৈরি করে উঠে এসেছেন।"

"সে বাড়িটা ছাড়লেন কেন কিছু জানেন?"—অশোক প্রশ্ন করল।

"হুঁ। শুনেছি সমুদ্রে জোয়ার এলে পাহাড়টার চারদিক জলে ভরে যায়, তখন নৌকোয় ছাড়া জমিতে আসবার আর কোনো উপায় থাকে না। তাই উদয়ানন্দ ওটা ছেড়ে এসেছেন!"

"ও!"—অশোক বলল, "যাই হোক, আপনি তা হলে এবার সেই খাতায় লেখা ঘটনার কথা বলুন।"

"বরং এক কাজ করি," ভবতোষবাবু বললেন, "খাতার তর্জমাটা নিয়ে এসে পড়ে শোনাই। হাবিজাবি অনেক কথাই তাতে লেখা আছে, তবে তার মধ্যে যতটুকু দরকারি ততটুকু বলছি, তুমি না হয় পরে পুরো তর্জমাটা ভালো করে পোড়ো।"

ভবতোষবাবু উঠে গেলেন এবং ঘরের মধ্যে থেকে একটা

ঝুরঝুরে পুরনো নোট-বই আর কতকগুলো টাইপ-করা কাগজ নিয়ে এলেন। "খাতাটা কার লেখা," চেয়ারে বসতে-বসতে তিনি বললেন, "তা জানা নেই। তবে উদয়ানন্দের যে পূর্ব-পুরুষ সম্বন্ধে লেখা তাঁর নাম কাওয়াসজি বাটলিওয়ালা।" তারপর নোট-বইটা অশোকের হাতে দিয়ে টাইপ-করা কাগজগুলো পড়ে চললেন। সেই ইংরিজির বাংলা করলে দাঁড়ায় :

কাওয়াসজির শরীরে ছিল পশুর মতো শক্তি, তাঁর মন ছিল পশুর মতই নির্মম আর তাঁর ছিলো অতুল ঐশ্চর্য! লোকে আড়ালে বলত জল-ডাকাতির গুপ্ত দল আছে; কিন্তু সামনা-সামনি কেউ একটা কথাও বলতে সাহস পেত না। আর তাঁর ছিলো ভারি অদ্ভুত একটা নেশা—দাবা! পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায় তাহলেও কাওয়াসজি দাবার ছক ছেড়ে কিছুতে উঠবেন না। আর এই সর্বনাশী নেশার সঙ্গে তাঁর মিশেছিলো সীমাহীন দম্ভ : দাবায় কেউ তাঁকে হারিয়ে দেবে এ কথা তিনি কোনোমতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না ছুনিয়ায় এমন কেউ থাকবে যার নাম খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর চেয়ে বড়। অদ্ভুত খেয়াল। কিন্তু সেকালের বড়লোকদের কথাই আলাদা! কাওয়াসজির মাইনে-করা লোক দেশ-বিদেশে ঘুরত নামজাদা খেলোয়াড় ডেকে আনবার জন্যে, আর সেই খেলোয়াড়কে পরাস্ত করার

দম্ভে কাওয়াসজির বিরাট অট্টালিকা মাঝেমাঝে কেঁপে উঠত উদ্ধত অট্টহাসিতে।

সেবার কাশী থেকে এল নাম-করা পণ্ডিত। শোনা গেল এমন খেলোয়াড় নাকি দুনিয়ায় নেই। কেউ বললে লোকটা তান্ত্রিক, কেউ বললে পিশাচ-সিদ্ধ, কেউবা বললে মন্ত্রসিদ্ধ! শোনা গেল এঁর তিনটে চাল টেঁকতে পারে এমন লোক নাকি পৃথিবীতে এ পর্যন্ত জন্মায়নি। টলমল করে উঠল কাওয়াসজির মন, ছক পেতে ডাকলেন পণ্ডিতজীকে। কিন্তু অত তাড়া কিসের? পণ্ডিতজী বললেন—আজ সন্ধেয় থাক, কাল সকালে বসা যাবে। পরের দিন সূর্যোদয়ের আগে আবছা নরম আলোয় দেখা গেল সমুদ্রের ধারে পণ্ডিতজী স্নান করছেন। স্নান শেষ হল, সমুদ্রের ওপারে উঠল টকটকে সূর্য। পণ্ডিতজী পাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। প্রাসাদে যখন ফিরলেন তখন তাঁর মুখ যেন থমথম করছে! অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন: পাতো ছক। দাবা খেলতে বসে কাওয়াসজির কোনদিন ভয় হয় নি, খেলোয়াড় হিসেবে তিনিও কম যান না। কিন্তু এই সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সামনে বসে সেদিন তাঁর বুকটা কেমন যেন দুরদুর করে উঠল। সত্যিই কি মন্ত্রসিদ্ধ? হয়ত তাই। কাওয়াসজির মনে কি রকম সব এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল—তিন চাল যেতে না যেতেই তিনি দেখলেন কিস্তির মুখে পড়েছেন এবং সে কিস্তি থেকে

বেরুবার সব পথ বন্ধ! সেদিন হাসবার পালা সূর্যপূজারীর—তাঁর অট্টহাসির প্রতিধ্বনি ঘুরতে লাগল বিরাট প্রাসাদটায়, কাওয়াসজির মনে হল প্রাসাদের প্রত্যেক ঘর থেকে বিদ্রূপ ঠিকরে আসছে। একি সত্যি মন্ত্রসিদ্ধি? লোকটা কি সত্যি যাদুকর? লজ্জায়, রাগে, অপমানে কাওয়াসজির সমস্ত শরীর মন ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। বললেন—বোস, আর এক বাজি খেলা যাক। কিন্তু দম্ভের দিক থেকেও ব্রাহ্মণ কাওয়াসজির চেয়ে কম নন; বললেন—তাড়া কি! দুপুরে ঘুমিয়ে নাও, মাথা ঠাণ্ডা হবে। বিকেলে আবার বসা যাবে। পারো ত ইতিমধ্যে খানিকটা গাওয়া ঘি খেয়ে নাও, মাথা খুলতে পারে। কাওয়াসজিকে বোবা আক্রোশ চেপেই রাখতে হল; তখনো তাঁর সামনে মাৎ-হয়ে-যাওয়া ছক!

লোকটা সত্যিই কিন্তু যাদুকর। সত্যিই কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধ! নইলে, বিকেলে আবার খেলতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাওয়াসজির সামনে সবকিছুই অমন এলোমেলো হয়ে গেল কেন? কিস্তি পড়ল, এবার বোড়ের কিস্তি, সবচেয়ে অপমানজনক কিস্তি! আরও অপমানজনক হল ব্রাহ্মণের হাবভাব—কিস্তি দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন, যেন তাঁর দেওয়া কিস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত। বললেন: তুমি চাল ভাবো। সমুদ্রের ধারে ততক্ষণ হাওয়া খেয়ে আসি।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, সমুদ্রের জল যেন রক্ত করবীর

মতো লাল। পণ্ডিতজী গিয়ে দাঁড়ালেন চকচকে বালির ওপর, আর সূর্যের দিকে মুখ করে স্তব্ধ তন্ময় হয়ে রইলেন। তাঁর হুঁস ভাঙল কাওয়াসজির উত্তেজিত ডাকে। কাওয়াসজির চেহারায় যেন ঝড় আসবার আগেকার স্তব্ধতা। বললেন—"খেলা ছেড়ে উঠে এলে যে!" পণ্ডিতজী অবাক হয়ে বললেন—"খেলা? খেলা ত শেষ হয়ে গিয়েছে।" "কী রকম? আমি চাল দিয়েছি। চলো।" পণ্ডিতজী হো-হো করে হেসে উঠলেন "অসম্ভব! আমার কিস্তির পরেও চাল? পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ তা পারেনি।" কাওয়াসজি যেন কথা বাড়াতে চান না, ছোট করে বললেন "দেখবেই চলো না।" "বেশ।" পণ্ডিতজীও এগুলেন। কিন্তু ঘরে ফিরে দাবার দিকে একটু চেয়ে পণ্ডিতজী হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, "জোচ্চর! ঘুঁটি নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক করেছো! ছক এ রকম ছিলো না।" "মুখ সামলে কথা বলো," কাওয়াসজিও চীৎকার করে উঠলেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল বাড়ির সমস্ত লোকজন! দুজনের বচসা প্রায় চরমে পৌঁছলো। শেষ পর্যন্ত কাওয়াসজি বললেন, "বেশ। আবার সুরু কর গোড়া থেকে।" কিন্তু না। পণ্ডিতজী কিছুতে রাজি নন। সূর্য ডুবে গিয়েছে। আকাশে সূর্য নেই। পৃথিবীতে অন্ধকার। এ সময় দাবার ছকে তিনি কোনোমতে বসতে রাজি নন। তাঁর খেলার সাক্ষী সূর্যদেব! খেলার প্রেরণা সূর্যদেব!

এবার হাসবার পালা কাওয়াসজির। "যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই! বুজরুক! মস্ত বড় বুজরুক! খেলতে শিখে তুমি হারাও না, তুমি হারাও দৈবের কৃপায়, সূর্য-সিদ্ধির জোরে।"

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু হাসাহাসিতেই শেষ হল না। দম্ভের সীমা নেই পণ্ডিতজীর! দম্ভের শেষ নেই কাওয়াসজির। প্রকাশ্যে দুটো দম্ভের ঢেউ উলটো মুখে এসে যেন ধাক্কা খেল আর সেই ধাক্কায় সবই একেবারে রসাতল হয়ে গেল! ব্যাপারটা গড়ালো হাতাহাতিতে এবং তারপর আরও জঘন্য অবস্থায়—খুনোখুনীতে! পণ্ডিতজীর কোমর থেকে বেরিয়ে এল চকচকে তীক্ষ্ণ ছোরা, কাওয়াসজির শরীরের প্রত্যেকটি পেশী ফুলে উঠল। বাড়িতে আর কোথাও টুঁ শব্দটি নেই; টুঁ শব্দ করবার সাহসও নেই কারুর। কাওয়াসজির রাগ সবাই জানে, সবাই জানে কী ভয়াবহ এর পরিণাম। সেই পরিণাম মেনে নিতে হল পণ্ডিতজীকে। বিরাট সবল একহাতে কাওয়াসজি ব্রাহ্মণের ছোরা-শুদ্ধ হাত চেপে ধরলেন আর এক হাতে টিপে ধরলেন তাঁর টুঁটি। তারপর টানতে-টানতে নিয়ে চললেন তাঁর দেহটা বাড়ির পেছুনের চোরা সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে। চোরা সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে একেবারে সমুদ্রের ওপরে গিয়ে। রুক্ষ পাথুরে মেঝের ওপর সমুদ্রের জল ছলাৎ-ছলাৎ করছে। লোকে বলত এটা জলপথে ডাকাতি করার জন্যে লুকিয়ে আনাগোনার পথ। মাথার ওপর লোহার বিম-বর্গা, তাতে

আংঠা পরানো, দড়ি বাঁধা। জোয়ারের সময় জল যখন মেঝে ছাড়িয়ে ফেঁপে ওঠে তখন সেই আংঠায় নৌকো বাঁধা হত।

পণ্ডিতজীর হাত থেকে ছোরাটা ছিনিয়ে নিয়ে কাওয়াসজি টান মেরে সমুদ্রের দিকে ফেলে দিলেন। তারপর এক হাতে তাঁর ঘাড়টা টিপে ধরে আর এক হাতে কড়িকাঠ থেকে দড়ি খুললেন। পণ্ডিতজীর পা দুটো শক্ত করে বাঁধলেন সেই দড়িতে আর তার-পর সেই দড়ি দিয়ে বাঁধা পা দুটো আটকে দিলেন কড়িকাঠের আংঠায়। হেঁটমুণ্ড অবস্থায় দুলতে লাগল পণ্ডিতজীর দেহটা। তারপর সুড়ঙ্গ ছেড়ে উঠে এলেন কাওয়াসজি। সেদিন ছিল অমাবস্যা।

কাওয়াসজির চোখে ঘুম নেই, দালানে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করে চললেন। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কাতর মিনতি আর গোঙানি ভেসে আসতে লাগলো। তারপর সমুদ্রে জোয়ার এলো, নোনা জল ফেঁপে উঠল আর সেই নোনা জলে ডুবে পণ্ডিতজীর গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল।

সকাল বেলায় কাওয়াসজি সুড়ঙ্গ বেয়ে নামলেন। দেখলেন জোয়ারের নোনা জলে ডুবে পণ্ডিতজীর মৃত মুখটা একে-বারে ফ্যাকাশে লালচে হয়ে গিয়েছে আর তাঁর মাথার ওপর একটা বাদুড় ঘুরপাক খাচ্ছে। বীরদর্পে কাওয়াসজি একবার পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন; তিনি হয়তো এক পৈশাচিক অট্টহাসি হেসে উঠতেন কিন্তু হাসতে পারলেন না।

তাঁর বিরাট সবল শরীর শিউরে উঠল এক অদ্ভুত আতঙ্কে: তিনি দেখলেন, স্পষ্ট দেখতে পেলেন পণ্ডিতজীর ফ্যাকাশে মুখে ফুটে উঠছে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট হাসি—সে হাসি বরফের মতো ঠাণ্ডা, বরফের মতো জমাট। উল্টো করে ঝোলানো ফ্যাকাশে নীলচে মুখে স্পষ্ট প্রতিশোধের হাসি! চেয়ে থাকতে-থাকতে কাওয়াসজির মাথার মধ্যেটা কী রকম ঝিমঝিম করতে লাগল, আর সেই বাদুড়টা—যেটা ঘুরপাক খাচ্ছিল পণ্ডিতজীর মৃতদেহের ওপর, সেটা সরে এসে ঘুরপাক খেতে লাগল কাওয়াসজির মাথার ওপর! কাওয়াসজি সেটার দিকে চাইলেন আর একেবারে চমকে উঠলেন: সমুদ্র থেকে ঠিকরে-আসা সকালের কোমল আলোয় মনে হল বাদুড়টাও কী রকম যেন অবাস্তব, কী রকম নীলচে যেন তার মুখটাও—আর যেটা সবচেয়ে বীভৎস—বাদুড়টার মুখেও অস্পষ্ট ঠাণ্ডা একটা হাসি!

কাওয়াসজির পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়—সুড়ঙ্গ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপছে! একটা চাপা আতঙ্কের চীৎকার বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে। বাদুড়টাও সুড়ঙ্গ দিয়ে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এসেছে এবং মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। দৌড়ে এল লোকজন, চাকরবাকর। কাওয়াসজি প্রায় উন্মাদের মতো চীৎকার করতে লাগলেন—'আমার শনি, আমার শয়তান! মেরে ফেল ওটাকে!' কিন্তু আশ্চর্য: তখন আর বাদুড়টার কোনো চিহ্ন নেই।

তারপর কিছুদিন কাটল একরকম নির্বিঘ্নেই। কাওয়াসজি অনেকটা যেন সামলে নিলেন। কিন্তু, ঠিক এক মাস পরে, আবার যেদিন অমাবস্যা ঘুরে এল, সেদিন সুরু হল সেই বিপদ। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর কাওয়াসজি শুয়ে-শুয়ে তামাক টানছিলেন, হঠাৎ মনে হল ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ। তিনি চমকে উঠে বসলেন। সামনের দিকে চাইলেন—কিছু নেই। ঘাড় ফেরালেন—পেছুনেও কিছু নেই! অথচ শব্দ! কাওয়াসজি ওপরের দিকে চাইলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন। একটা বাদুড়—সেই বাদুড়টাই! মনে হল নরকের আগুন থেকে সবেমাত্র উঠে এসেছে, তার গায়ে নরকের নীলচে আভা আর সবচেয়ে বীভৎস, সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হল তার ফ্যাকাশে মুখে একটা অদ্ভুত হাসি,—পণ্ডিতজীর মৃত মুখের মতো। এল লোকজন, এল আলো। কিন্তু তখন আর বাদুড়টার চিহ্ন নেই!

তারপর আবার এক মাস কাটল প্রায় শান্ত ভাবেই। আবার অমাবস্যার রাত এল আর এল প্রেতলোকের সেই প্রতিনিধি! সেদিনও রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তিনি শুয়েছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল পাশের ছোট ড্রেসিং-রুমটায় তিনি দামী হীরে-বসানো রিস্টওয়াচটা ফেলে এসেছেন।

রিস্টওয়াচটার কথা মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কাওয়াসজি বিছানা ছেড়ে উঠলেন, ড্রেসিং-রুমে গেলেন। পাশের ঘরটায়

প্রকাণ্ড এক ড্রেসিং টেবিল আর কাপড়ের আলনা ছাড়া কিছু ছিল না। কাওয়াসজি ঘরে ঢুকেই কিন্তু একেবারে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন : ঠিক সামনে, ড্রেসিং-টেবিলটার কাছে, হাওয়ায় ভাসছে একটা মানুষের মুখ, সোজা ভাবে নয় উলটো ভাবে ! কার মুখ চিনতে দেরি হয় না।···কাওয়াসজির অচেতন শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর একটা অদ্ভুত ভয় তাঁকে পেয়ে বসল। দিন নেই রাত নেই—একটা অস্পষ্ট আতঙ্কে তিনি শিউরে ওঠেন। বিড়বিড় করে শুধু বলেন : অভিশাপ, সেই সূর্যপূজারীর অভিশাপ। আমি বেশ বুঝছি আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি প্রেতলোকের ডাক, আমায় যেতে হবে। সেখানে আমার সঙ্গে সূর্যপূজারীর বোঝাপাড়া !

অদ্ভুত ভয়। আর এই ভয়ের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যে অদ্ভুত উপায় ! কাওয়াসজি আফিম ধরলেন। কিন্তু আফিমের পরিমাণ দিনকের দিন যতই বেড়ে চলুক অভিশাপের হাত থেকে নিস্কৃতি নেই, মুক্তি নেই প্রেতের আহ্বান থেকে। প্রতি অমাবস্যার রাতে সেই প্রেত দেখা দিতে সুরু করল আর মনে করিয়ে দিতে লাগল বিচারের দিন ঘনিয়ে আসছে। এইভাবে কাটল পুরো ন'মাস। তখন কাওয়াজির অবস্থা একেবারে পাগলের মতো ! আফিমের মাত্রাও প্রায় সম্ভবের সীমা পেরিয়ে গিয়েছে !

সেদিনও ছিল অমাবস্যার রাত। কাওয়াসজি প্রেতের আহ্বানকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। স্বপ্নচালিতের মতো নিঃশব্দে চললেন সেই সুড়ঙ্গের দিকে। আর পরদিন সকালে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল সুড়ঙ্গের মধ্যে। পাশে পড়ে রয়েছে আফিমের আধখালি একটা বড় কৌটো। ভয়ে না আফিমের বিষে—কিসে মৃত্যু হয়েছে বোঝা গেল না।

সূর্যপূজারীর অভিশাপ কিন্তু তাঁর মৃত্যুতেই শেষ হয়নি। তাঁর বংশে এ অভিশাপ ঘুরে ফিরে দেখা দিতে লাগল। কিন্তু দেখা দিতে লাগল এক ভারি আশ্চর্য ভাবে—ঠিক এক পুরুষ অন্তর। তাঁর ছেলের কোনো বিপদ ঘটেনি, কিন্তু সেই ছেলের আর ছেলে ছিল না বলে তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি যায় তার ভাইপোর হাতে। এবং এই অভিশপ্ত সম্পত্তি পাবার পর সে-ও পায় প্রেতের আহ্বান। সে আহ্বান প্রথম এল অমাবস্যার রাতে এবং আটটা অমাবস্যা কাটবার আগেই আফিমের নেশায় আর প্রেতের আতঙ্কে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়। নবম অমাবস্যার পরদিন তারও মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে। এবারও বোঝা যায় নি, ভয়ে না আফিমের বিষে—কিসে হল তার মৃত্যু! এক পুরুষ অন্তর এই বংশে সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুরে ফিরে দেখা দিচ্ছে। এর শেষ কোথায়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের সংস্কার

ভবতোষবাবু কাগজগুলো গুছিয়ে টেবিলে রাখলেন।

চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। অশোক সমুদ্রের দিকে অলস ভাবে চেয়ে কী যেন ভাবছে। কুঁচকে উঠেছে তার বাঁ কপালের শিরা, তার ডান হাত বেতের চেয়ারের হাতলে, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন ভাবে টেবিলের ওপর টোকা দিচ্ছে।

সকলের চোখ অশোকের মুখের ওপর ; অশোকের চোখ সমুদ্রের ওপর কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে !

স্তব্ধতা ভাঙলেন দিদি, "কী ভাবছ অশোক ?"

অশোকের মুখে খুব পাতলা, খুব ঠাণ্ডা এক রকম হাসি ফুটে উঠল। বাঁ-দিকের কপালটা সহজ সরল হয়ে এলো। "ভাবছি," সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতেই অশোক বলল, "শাস্ত্রে আছে মুনি-ঋষিদেরও মাঝেমাঝে ভুলচুক হয়।"

"কিন্তু হঠাৎ এ-কথার মানে ?"

"মানে কিছুই নেই। এমনি বললাম।"

"উঁহু। এমনি বলবার ছেলে ত তুমি নও।"

অশোকের মুখের ফিকে পাতলা হাসি আস্তে-আস্তে যেন

জমাট বাঁধতে লাগলো। আপন মনেই বলল, "মুনি-ঋষিদেরই যখন ভুলচুক হয় তখন সামান্য প্রেতের ত হতেই পারে। তবে এ প্রেত খুব সাধারণ প্রেত নয়, ধুরন্ধর প্রেত।"

"প্রেতের ভুলচুক ?"

"হুঁ। তবে অনেকখানি নির্ভর করছে ভবতোষদা যে অনুবাদটা পড়লেন সেটা কতখানি খাঁটি অনুবাদ তার ওপর।"

"কিছুই বুঝছি না বাপু," ভবতোষবাবু বিব্রতভাবে বললেন, "হেঁয়ালী রেখে সোজা কথা বল।"

"এখন কিছু বোঝবার দরকার নেই," অশোক বলল, "আপনি উঠে স্নান-খাওয়া করতে যান। খাতাটা আর টাইপ-করা কাগজ-গুলো আমায় দিয়ে যান। আমি ততক্ষণ কুনুকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে খানিকটা ঘুরে আসি।"

কুনু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অশোকেব মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। একটা কী রকম আদেশের ভঙ্গী অশোকের মুখে। কুনু বুঝল বেড়াতেই যাক আর বেড়াতে যাবার নাম করে নরকেই যাক, এখন তর্ক করবার উপায় নেই। মানতে হবে। আদেশের স্পষ্ট ছায়া অশোকের মুখে। ফলে, কোমর থেকে চাদরটা নামিয়ে কুনু উঠে পড়ল!

পুরনো ঝুরঝুরে খাতা আর টাইপ-করা কাগজগুলো গুছিয়ে নিতে-নিতে অশোকও উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ওপরকার চামড়ার ছোট বাক্সটার দিকে চেয়ে দিদিকে বলল, "ওটা খুব

সাবধানে আমার ঘরে রেখে দিও। প্রেতের সঙ্গে লড়াই করতে হলে পদে-পদে ওটার দরকার পড়তে পারে।”

তারপর অশোক আর কিছু বলল না। সোজা হাঁটতে সুরু করল ফটকের দিকে। কুন্নু বেচারা নিরুপায় ভিজে বেড়ালটির মত চলল তার পেছুপেছু।

ফটক পেরিয়ে অশোক বলল, “ত্রিবেদীকে চিনিস?”

কুন্নু অবাক হয়ে বলল, “কে ত্রিবেদী?”

“এখানের রামরুইয়া কলেজের অধ্যাপক। ভারি পণ্ডিত লোক।”

“কিন্তু আমি চিনব কেমন করে?”

“তাই ত ভাবছি। চ আমার সঙ্গে। আলাপ করে তৃপ্তি পাবি। গোটাকতক বাড়ির পরেই থাকেন। মারাঠি লোক; বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু জানেন না হেন বিষয় নেই। বিশেষ করে এ অঞ্চলের ইতিহাস ও এদিকে প্রচলিত প্রত্যেকটি ভাষা সম্বন্ধে সত্যি অগাধ জ্ঞান। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে-বেড়াতে সেদিন আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দুদণ্ড কথা বললেই বুঝবি কী অসাধারণ পণ্ডিত!”

“দেখ অশোক,” হাঁটতে-হাঁটতে গোঁয়ার ঘোড়ার মতো কুন্নু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, “দেখ অশোক, তুই ত জানিসই ছেলেবেলা থেকে কোনদিনই আমার পণ্ডিতদের সঙ্গে বনে না। ইস্কুলে হেডপণ্ডিতমশাই আমাকে কোনদিন ক্লাসে বসতে দিতেন না,

আমিও কোনদিন তাঁকে নির্বিঘ্নে পড়াতে দিতুম না। পণ্ডিতেরা আমায় পছন্দ করেন না, আমিও পণ্ডিতদের—”

কুনুর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে অশোক হঠাৎ বলে উঠল, “এই বাঁ দিকের বাড়িটাই। চ তোকে মানুষ করে আনি!”

অধ্যাপক ত্রিবেদী অত্যন্ত সৌম্য প্রকৃতির ভদ্রলোক। কম কথা বলেন, কিন্তু যে কটি কথা বলেন তার প্রত্যেকটিই ওজন করা; শুনলেই বোঝা যায় অনেকখানি তলিয়ে, হিসেব করে, তবে বলছেন।

“আসুন মিঃ রায়,” ত্রিবেদী অশোককে দেখে আনন্দে যেন ভরে উঠলেন।

অশোক কুনুর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

“আপনিও কি আপনার বন্ধুর মতো সমাজতত্ত্ব নিয়েই গবেষণা করেন?” ত্রিবেদী প্রশ্ন করলেন কুনুকে। কুনু ত অবাক! এই ত্রিবেদী বলে পণ্ডিতটি যদি পাগল না হয় তাহলে তার কথার একমাত্র মানে দাঁড়ায় এই যে অশোক সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে। অথচ, নেহাৎ পাগল ছাড়া এমন কথা আর কে বলতে পারে? গোয়েন্দাকে সমাজতত্ত্বের গবেষক বলে মনে করা ত সুস্থ মাথার লক্ষণ নয়। হতভম্ব হয়ে কুনু অশোকের দিকে চাইল; কিন্তু অশোকের মুখে সেই অদ্ভুত হাসি, সে হাসির মানে কুনু আজ পর্যন্ত আঁচ করতে পারল না।

"কিন্তু মিঃ রায়," অধ্যাপক ত্রিবেদী বলে চললেন, "সেদিন আপনার সঙ্গে আলোচনা হবার পর ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, নিজের সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। আপনার—"

অশোক বাধা দিয়ে বলে উঠল, "সে তর্ক আপনার সঙ্গে পরে হবে। আপাতত, একটা দায়ে পড়ে এসেছি। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন—"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—"

"একটা খুব পুরনো খাতা জোগাড় করেছি। সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে পারলে খুশি হতুম।"

"আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় সানন্দে করব।"

"গুজরাটি ভাষায় লেখা খাতা। এ অঞ্চলের পুরনো ইতিহাসও তাতে কিছু পাওয়া যাচ্ছে। আমি না জানি এর ভাষা, না জানি এ অঞ্চলের কথা। তাই গোটাকতক জিনিস আপনার কাছে যাচাই করিয়ে নিতে চাই। মনে হয়ে, খাতার লেখক শ'দেড়েক বছর আগে এ দিকে বাস করতেন। আপনাকে অনুরোধ করছি খাতাটা ভাষার দিক থেকে এবং ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে নির্ভুল কিনা বিচার করে দেখতে।"

খাতাটা হাতে নিয়ে ত্রিবেদী অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন, "এটা যে একটা অতি প্রাচীন পুঁথি তা ত চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কালিটা ফ্যাকাশে বাদামি হয়ে গিয়েছে, পাতাগুলো হয়ে গিয়েছে ঝুরঝুরে হলদে। নির্ভুল

কি না প্রশ্ন করছেন কেন? এর মধ্যে থেকেই হয়ত এমন কয়েকটি দুমূ্ল্য তথ্য পাওয়া যাবে যার ওপর নির্ভর করে প্রাচীন গুজরাটি ভাষা এবং এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মতবাদগুলি যাচাই করে নেওয়া যাবে। খাতাটার যে বয়েস দেড়শ'র ওপর তা ত আপনি দেখেই বুঝতে পারছেন।"

"হুঁ। শুধু চোখে দেখে ত তাই মনে হচ্ছে!"

ত্রিবেদী খাতাটার পাতা উল্টে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তাঁর চোখদুটো চকচক করতে লাগলো। "মিঃ রায়," সোৎসাহে তিনি বললেন, "খাতাটা আমার কাছে রেখে যেতে পারেন? এর মধ্যে এমন সব কয়েকটা তথ্য পাচ্ছি যার ওপর নির্ভর করে প্রবন্ধ লিখলে প্রাচীন গুজরাট সম্বন্ধে প্রচলিত থিয়োরিগুলো গুঁড়ো করে ভেঙে ফেলতে পারব।"

"বেশ ত," অশোক বলল, "আজ দুপুর তিনটে নাগাদ এসে খাতাটা নিয়ে যাব। ততক্ষণ আপনি পড়ুন।"

"কিন্তু এ খাতা ফেরৎ নিয়ে আপনি কী করবেন? আপনি ত এ ভাষা জানেন না। অথচ এ খাতাটা যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন তা হলে—"

"বেশ ত। সেটা আর এমন কী বেশি কথা হল! আজ দুপুর তিনটে থেকে শুধু পাঁচটা পর্যন্ত খাতাটা আমার চাই। তারপর আপনাকে দিয়ে দেব, আপনার মহামূল্য প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ লিখবেন।"

ত্রিবেদী অবাক হয়ে অশোকের দিকে চেয়ে রহলেন।

অশোক উঠে দাঁড়াল।

"তা হলে আমি তিনটে নাগাদ এসে খাতাটা নিয়ে যাব; ইতিমধ্যে আপনি যদি একটু পড়ে রাখেন এবং আমায় যদি তখন জানান কোন-কোন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হল, তাহলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব।" তারপর কুনুর দিকে ফিরে বলল, "চল কুনু, আমাদের আবার এখনি হর্নবি রোডে যেতে হবে।"

"হর্নবি রোড! সে আবার কি?"

"সেখানেই ত খবরের কাগজের বড়-বড় আপিস।"

"কিন্তু," ত্রিবেদী ব্যগ্রভাবে বললেন, "আপনি খবরের কাগজে এখনি খাতাটার খবর দেবেন না! তা হলে ওরা এখনি এমন হৈচৈ পড়িয়ে দেবে!—জানেনই ত বোম্বাই-এর কাগজ-ওয়ালারা একটু ছুতো পেলেই লম্বাই-চওড়াই খবর ছাপিয়ে দেয়।"

"হুঁ। তাই ত দেখছি। এ খাতাটার কথা আমি কিছুই বলব না; তবে ওরা যে কেমন করে খবর জোগাড় করে সেটুকু জানবার আগ্রহ হয়েছে।"

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করল, "তাহলে এখন উঠি। দুপুর তিনটে। কী বলেন?"

"হুঁ, তিনটে!" খাতাটার প্রতি আত্মনিয়োগ করে ত্রিবেদী বললেন, "নমস্কার।"

পথে বেরিয়ে এল আশোক আর কুনু।

"তুই ঠিকই বলেছিলি, কুন্নু। পণ্ডিতেরা আসলে কোনো কাজেরই নয়!" অশোক পথে বেরিয়ে বলল, "জানতে চাইলুম খাতাটা ঠিক আছে কিনা আর ভদ্দরলোক ভাবতে বসলেন দেড়শ বছর আগেকার ইতিহাসটা ঠিক আছে কিনা!" কুন্নু এসবের কিছুই মানে বুঝতে পারছিলো না। অবাক হয়ে অশোককে কী যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। কিন্তু অশোক তখন তীব্রভাবে মুখ দিয়ে "স্‌…স্‌…" করে শব্দ করছে। চীৎকার করে শিষ দেবার মতন অনেকটা! কুন্নু আরও অবাক হয়ে গেল যখন দেখল সেই শব্দের আহ্বানে পথের ধাবন্ত একটা ট্যাক্সি বোঁ করে ঠিক ওদের সামনে এসে ব্রেক কসল।

"হর্নবি রোড," গাড়িতে উঠে অশোক ড্রাইভারকে বলল। তারপর পাশে কুন্নুর দিকে চেয়ে, "তুই ত আর বোম্বাই সহর ঘুরে দেখলি নে। এখানে লোকজনকে ডাকতে হলে ওই রকম কুস্বর করতে হয়।"

ট্যাক্সি ছুটে চলল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ওষুধের দোকানে চাবি

কনু অবাক হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই বোম্বাই সহর অশোকের যেন নখদর্পণে এসে গিয়েছে। কুনুর এখনো দীর্ঘ ট্রেন-জার্নির ব্যাথা গা থেকে মরেনি, হাই তুলতে-তুলতে আর আলসেমি করতে-করতে ও ভাবছিল বিশ্রাম এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। আর এরই মধ্যে কোন ফাঁকে বেরিয়ে আর বেড়িয়ে অশোক রীতিমতো সহর আর শহরতলি চষে ফেলেছে। এবং, শুধু তাই নয়, খুঁটিনাটি পথঘাট পর্যন্ত যেন মুখস্থ করে ফেলেছে! ট্যাক্সিতে দ্রুত বেগের সঙ্গে সমানে তাল রেখে অশোক গড়গড় করে কুনুকে বুঝিয়ে চলল, "এই হল দাদার। এদিকেই বোম্বাই-এর আসল বাঙালী মহল। একটু এগিয়েই বাঙালী ছেলেমেয়েদের ইস্কুল। প্যারেল। প্যারেলের ময়দান।···গিরনি কামগড় ইউনিয়ন। ভারতবর্ষে মজুরদের এত বড় ইউনিয়ন আর কোথাও নেই।··· সিনেমার স্টুডিও বাঁ দিকে এগুলে। কত স্টুডিও আছে বোম্বাইতে? ওঃ অনেক।···ছাপা সাড়ির দোকান।···আর একটু ওপাশে এগুলে কোলাপুরি চটির আড়ৎ পাওয়া যাবে।···"

অবশেষে হর্নবি রোড। খবরের কাগজের আপিস খুঁজে বের করতে একটুও কষ্ট হল না কিন্তু কষ্ট হল কর্তাদের কাছে

আসল কথাটা পাড়তে। অশোক বলতে চায় যে প্রতাপচন্দ্রের মস্তিষ্ক বকৃতির খবর খবরের কাগজওয়ালাদের পক্ষে অত তাড়া-তাড়ি, প্রায় রাতারাতি, পাওয়া একেবারে তাজ্জব ব্যাপার বলেই মনে হয়। কেন না, এ কোন সভাসমিতির খবর নয়, মিছিল-মজলিসের খবর নয়, খেলাধুলোর খবর নয়, সিনেমা-থিয়েটারের খবর নয়, যে কাগজওয়ালারা আগে থেকেই আঁচ করে ওৎ পেতে বসে থাকবে। প্রতাপচন্দ্রও যেমন চাপা প্রকৃতির লোক বলে শোনা গেল যে তিনি স্বেচ্ছায় সবাইকে ডেকে এ-কথা বলে বেড়াবেন তাও ত মনে হয় না। তাহলে খবরটা বেরুল কেমন করে? আর শুধু যে বেরুল তাই নয় একেবারে খবরের কাগজে ছাপা হয়ে গেল!

কুনু অবশ্য অশোকের আসল উদ্দেশ্যটা ঠাহর করতে পারেনি। না হয় মানাই গেল যে খবরটা বেরুবার কথা নয় তবুও বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি ছাপা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে ভূত ধরবার যোগাযোগ কোথায়? ট্যাক্সিতে আসতে-আসতে এ নিয়েও দুজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। অশোক সোজা জবাব দিতে চায়নি। হেঁয়ালী করেই বলেছিলো, "খবরটা স্বয়ং ভূত খবরের কাগজের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন কি না তা আবিষ্কার করা দরকার।"

কিন্তু কে যে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে তা আবিষ্কার করা অমন সোজা নয়। কাগজওয়ালা শুধু জাঁক করে বলে, "আমাদের

কাগজ কি অমন যা-তা কাগজ! দুনিয়ার কোথায় কী হচ্ছে তার সবটাই আমাদের নখদর্পণে!" অশোক নানান ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটা পাড়তে চায়, নানান ছলে বের করতে চেষ্টা করে খবরটা কেমন করে তারা পেল! কিন্তু বুদ্ধির লড়াই করা যায় শুধু তার সঙ্গেই যার বুদ্ধি আছে; কিন্তু যে বোকার মতো কেবল দম্ভ করে বুদ্ধির বড়াই করে চলে তার সঙ্গে চলে না। কাগজের বড়কর্তা, মেজকর্তা, সব কর্তাই শুধু বুক ফুলিয়ে বলেন, "দুনিয়ার সকলের হাঁড়ির খবর আমরা জানি মশাই, একেবারে হাঁড়ির খবর জানি। ওই ত আমাদের ব্যবসা!"

অশোক একটু বিরক্ত হয়ে বলে, 'সে খবরটুকু ত আমিও জানি 'যে দুনিয়ার সব খবর আপনারা জানেন। কেবল দয়া করে বলে ফেলুন এই খবরটা কেমন করে জানলেন?"

কর্তারা হাসেন। "জানলুম? আসলে সেইটুকুই ত আমাদের ট্রেড-সিক্রেট, ব্যবসার গোপন রহস্য। সেটা বুঝলে ত আপনিও হর্নবি রোডে খবরের কাগজের দপ্তর ফাঁদতে পারতেন!"

"ধুত্তোর ট্রেড-সিকরেট," পথে বেরিয়ে অশোক অত্যন্ত বিরক্তভাবে কুনুকে বললে। "এক একটি একেবারে দম্ভের ফানুস, অহংকারের আকাশে হুসহুস করে উড়ছে!"

কুনু বললে, "তোরই বা এ খেয়ালের কী মানে হয় বুঝলুম না। ভূত ধরতে বেরিয়ে ভূতের খবর কে প্রথম জানাল তাই নিয়ে মাথা ব্যথা কেন?"

"দেখি", অশোক বলল, "ভূতটা যদি ধরতে পারি তখন নিজেই বুঝতে পারবি।"

"আর তখন," কনু অশোককে একটু উৎসাহ দেবার আশায় বলল, "এই সব পেটমোটা কাগজ-ওয়ালারাই ভীড় করে আসবে, অনুনয় করে বলবে কেমন করে ভূতটা ধরা পড়ল; আর তখন আমি এই ফানুসগুলোর পেটে খোঁচা মেরে ভুষভুষ করে সমস্ত দম্ভের ধোঁয়া বের করে দেব।"

অশোক হাসতে-হাসতে বলল, "কিন্তু তার আগে ভূতটাকে ধরা দরকার।"

"তা ত নিশ্চয়ই!"

"চল তা হলে সেই চেষ্টা করা যাক।"

"কোথায় যাবি?"

"প্রথম, অধ্যাপক ত্রিবেদীর বাড়ি যাওয়াই উচিত। ভদ্দর-লোক যেমন ছিটগ্রস্ত মানুষ, মনে হয় তাঁর কাছ থেকেও যে-সব খবর পাব আশা করেছিলুম তাও পাব না। তাই খবর বের করবার অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথমে একটা ওষুধের দোকানে যাওয়া যাক।"

"ওষুধ? সেখানে কী খবর পাবি?"

"খবর পাব না, তবে খবর বের করবার চাবি পাব।"

"ওষুধের দোকানে চাবি?"

"হুঁ। চ না।"

প্রকাণ্ড ওষুধের দোকান। অশোক কতকগুলো এ্যাসিড প্রভৃতির নাম বলতে দোকানদার কপাল কুঁচকে একটু চেয়ে রইল। তারপর সন্দেহের গলায় বললে, "ডাক্তারের প্রেস-ক্রিপসন আছে?"

অশোক অম্লান বদনে বলল, "হুঁ।" বলে, পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে তার একটা পাতা ছিঁড়ে ঘসঘস করে ঠিক প্রেসক্রিপসন লেখার মতো লিখে ফেলল এবং তলায় একটা নাম সই করে দিল। কুনু চোখ গোলগোল করে বন্ধুর কাণ্ডটা দেখতে লাগল: অশোক যে কস্মিনকালেও ডাক্তার নয় এ কথা কুনু যত ভালো করে জানে তত ভালো করে আর কেউ নিশ্চয় জানে না। অথচ, কুনুর দেখে ভারি মজা লাগল যে, অশোক পাকা ডাক্তারের মতো প্রেসক্রিপসন লিখতে পারে এবং বেমালুম মিছে একটা বাজে সইও পারে করে দিতে! কুনু আরও অবাক হয়ে দেখল অশোক নিজের সই-এর পাশে দিব্বি নির্লিপ্তভাবে একটা কী যেন উপাধি বসিয়ে দিল।

দোকানদার কপাল কুঁচকেই কাগজটা নিল এবং তার পরমুহূর্তে তার চোখমুখের চেহারা বদলে গেল। অপ্রস্তুত ভাবে প্রশ্ন করল, "আপনিই কলকাতার সেই বিখ্যাত ডাক্তার এইচ. ঘোষ. এম্.ডি.?"

অশোক একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, "হুঁ।"

দোকানদার প্রায় গদগদ ভাবে বলল, "কাগজে দেখেছিলুম আপনি একটা বিশেষ কেস নিয়ে বোম্বাই আসছেন।"

অশোক বলল, "জানেনই ত কাগজওয়ালারা সবাইকার হাঁড়ির খবর রাখে।"

"কিন্তু," দোকানদার বলল, "আপনি যে স্বয়ং আমার দোকানে পদধূলি দেবেন এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

"দেখুন," অশোক ভারিক্কি চালে বলল, "আমি রোগীকে যখন যে ওষুধ দিতে চাই তা শুধু প্রেসক্রিপসনে লিখেই দিই না। বরাবর ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে নিজে তদারক করে ওষুধ তৈরি করাই। সব কম্পাউণ্ডারেরই ত হাত সমান হয় না!"

"এরকম সাবধানী না হলে কি আর অতবড় ডাক্তার হওয়া যায়?" শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে দোকানদার প্রায় নুয়ে পড়ল—বলল, "চলুন, আপনি ওষুধ তৈরি নিজে দেখবেন চলুন।"

"না, আমিই বাড়িতে মিশিয়ে ঠিক মতো ওষুধ তৈরি করে নেব। এ কেসটা বড় কঠিন কেস, নানান রকম পরিমাণ দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। আপনি আমায় এই ওষুধগুলো খাঁটি দিন। দেখবেন, পুরনো স্টক না হয়।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই", বলতে-বলতে দোকানদার নিজের কোটের সামনের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরের দিকে গেল।

ওষুধের বোতল-টোতলগুলো ভালো করে গুছিয়ে ট্যাক্সিতে

বসে স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে অশোক বলল, "ভাগগিস খবরের কাগজওয়ালারা সবাইকার হাঁড়ির খবর রাখে! তা নইলে আমিই কি ছাই জানতে পারতুম কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার এইচ. ঘোষ., এম. ডি. আজ এখানে এসে পৌঁছোবেন!"

"কিন্তু থেকে-থেকে তাঁর সই জাল করতে গেলি কেন?"

"নইলে ভাই অনেক হাঙ্গামা হোত। ডাক্তারের সই ছাড়া ওষুধগুলো পাওয়া কঠিন; আর দেখছিসই ত বোম্বাই সহরের ছব্বা—কোনো ডাক্তারকে যদি বলতুম সই করে দিতে তা হলে জেরা করে-করে একেবারে ফ্যাচাখেকো করে তুলতো!"

"কিন্তু ডাক্তার ঘোষের ত বয়েস হয়েছে। দোকানদার যদি ধরে ফেলত!"

"ঠিক বলেছিস", অশোক বলল, "তবে দোকানদারের চেহারা দেখে মনে-মনে ঠিক বুঝে ফেলেছিলুম যে তার বুদ্ধি তোর চেয়েও মোটা!

কুনু রীতিমতো রাগ করে ট্যাক্সির জানলার বাইরে চেয়ে রইল। বুদ্ধি নিয়ে অশোক যখন খোঁটা দেয় তখন সত্যিই ওর আত্মসম্মানে লাগে। কেন না, ও জানে অশোককে কোনদিন বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করে উচিত শিক্ষা দিতে পারবে না।

অধ্যাপক ত্রিবেদী প্রায় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "সেকি? খাতা-খানা আপনি ফেরত নিয়ে যাবেন? ও খাতাটায় আপনার কী

লাভ হবে বলুন? অথচ, প্রাচীন গুর্জর সম্বন্ধে কত অদ্ভুত তথ্য আমি ওর মধ্যে খুঁজে পেয়েছি!"

"অদ্ভুত মানে নতুন, কী বলুন?"

"নিশ্চয়ই নতুন। অনেক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক মতবাদ এ খাতার সাক্ষীর সামনে একেবারে ভেঙে পড়বে।"

"তার মানে, আপনি মেনে নিচ্ছেন খাতাটা খাঁটি?"

"তার মানে?"

"তার মানে, এমন ত হতেই পারে যে খাতাটা আসলে জাল। তা হলে প্রাচীন গুজরাট সম্বন্ধে মতবাদকে শুধরে নেবার কথাই যে ওঠে না।"

"জাল? এ কথা যে ভাবাই যায় না! খাতাটার চেহারা একবার ভালো করে দেখুন—হলদে ঝুরঝুরে খাতা। এ খাতা কখনো জাল হতে পারে?"

"ইংরিজিতে একটা কথা আছে—যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।"

অধ্যাপক ত্রিবেদী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

"খাতাটা যে জাল," অশোক বলে চলল, "এ সন্দেহ আপনার কথা শুনে আমার মনে আরও বদ্ধমূল হল। আপনার কথার সারমর্ম এই যে প্রাচীন গুজরাটের ইতিহাসের সঙ্গে এতে যে-সব বর্ণনা আছে সে সবগুলো ঠিক খাপ খায় না। এই ত?"

"হুঁ।"

"সেটুকুই আমি জানতে চেয়েছিলুম।"

"কিন্তু তার কারণ ত এও হতে পারে যে খাতাটা ভুল নয়, আসলে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের মতবাদগুলোই ভুল।"

"হতে পারে বই কি। নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে অনেক সময়েই ত মানুষের মতবাদ বদলায়।"

"তা হলে এ ক্ষেত্রে যে তা হবে না তার প্রমাণ কী?"

"প্রমাণের দাওয়াই কিনে এনেছি। বাইরের গাড়িতে আছে।"

"দাওয়াই ?"

"হুঁ। দাওয়াই। বড় কড়া-কড়া দাওয়াই। খাতাখানা তা হজম করতে পারলে বুঝব ইতিহাসকে সংশোধন করবার ক্ষমতা তার আছে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, বেচারা অত কড়া দাওয়াই হজম করতে পারবে না।"

অধ্যাপক ত্রিবেদী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। কনু বোকার মতো অশোকের পেছুপেছু ট্যাক্সিতে উঠল। অশোকের হাতে ঝুরঝুরে পুরনো খাতাটা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খাতার সঙ্গে বোঝাপাড়া

"কুন্নু", বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর অশোক বলল, "এখন তুই একটু বিশ্রাম নিতে পারিস ; বিকেলে একবার আমার সঙ্গে বেরুলেই হবে। কিন্তু এখন তোর কোনো কাজ নেই।"

"তুইও একটু বিশ্রাম নে না", কুন্নু বলল, "তোর খাটুনিও ত কম হয়নি"—ভাবখানা এই যে আসল যা কাজকর্ম তার সবটা যেন কুন্নুই করেছে, অশোক নেহাত সহকারির মতো পেছুপেছু ঘুরেছে মাত্র।

"উঁহুঁ, আমার এখন আলসেমির সময় নেই", অশোকের গলায় কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক ভাব, "বিকেলের আগেই খাতাটার সঙ্গে বোঝাপাড়া শেষ করতে হবে।"

"খাতাটার সঙ্গে বোঝাপাড়া?", দিদি অবাক গলায় বললেন।

"বলো কি?" ভবতোষবাবুর গলাতেও বিস্ময় কম নয়।

"হুঁ। ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। দেখতে হবে ওর সাক্ষী আসল না নকল।"

"হঁয়ালী-হেঁয়ালী কথা রাখো," ডুটো গালে একসঙ্গে ছটা পান পুরে চিবুবার চেষ্টা করতে-করতে ভবতোষবাবু বললেন, "বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে বলো খাতাটাকে কী করতে চাও।"

"আপনারা, মানে উকিলরা", অশোক বলল, "সোজা বাংলায় যাকে বলেন cross examine—"

"তার মানে?"

"মানে জেরা।"

"নাঃ দিদি," কুনু এতক্ষণে বেশ একটু উৎসাহ ভরে বলল, "ভবতোষদা যে কেমন উকিল তা এতক্ষনে বুঝলুম। জেরা মানে জানেন না? যাকে বলে cross examine—"

"আঃ হা," ভবতোষবাবুর গলায় গভীর অশ্বস্তি, "এখনো হেঁয়ালী! এদিকে বলে আমার মক্কেলের মাথা খারাপ হয়ে সম্পত্তি বেহাত হবার জোগাড়—কোথায় তার একটা হিল্লে করবে, আর তা নয় হেঁয়ালী!"

"হেঁয়ালী মানে? সত্যিই খাতাটাকে জেরা করতে হবে", অশোক বলল।

"হঁয়ালী নয় মানে? খাতা কি ভাড়াটে সাক্ষী যে জেরা করবে?"

"এ ক্ষেত্রে ত প্রথম থেকেই আমার তাই সন্দেহ হচ্ছে।" অশোকের গলায় চাপা গাম্ভীর্য, বোঝা যায় যে আর বেশি কথা কইতে চাইছে না। হয়ত সময় নেই, তাই। "আচ্ছা ভবতোষদা", অশোক একটু থেমে আবার বলল, "এতদিন ত ওকালতি করেছেন, আজ আপনাকে হাকিম করে দিলুম, আমি হলুম উকিল, আর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাক খাতাটাকে।"

"আর আমরা ?" দিদি ফস ক'রে প্রশ্ন করলেন।

"হুঁ আমরা ?" কুনুর গলায় বেশ একটু ঝাঁঝ, "আমরা কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে এসেছি ?"

"এই বিচার ব্যাপারটার মধ্যে তুইও থাকতে চাস ? বেশ দিদি, তাহলে তুমি আর কুনু জুরি হও—এমন সুযোগ আর জীবনে পাবে না, জুরি হওয়া কম খাতিরের নয়।"

"আঃ হা, ছেলেমানুষি রাখো," ভবতোষবাবু উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন, "ভুলে যেও না আমার মক্কেলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, খবরের কাগজে তা প্রকাশও হয়ে গিয়েছে, এখন বাকি শুধু তার সম্পত্তিটুকু বেহাত হওয়া।"

"হুঁ", অশোক বলে চলল, "প্রত্যেকটি কথা মনে রাখতে হবে এবং তা ছাড়া ভুললে চলবে না যে এই খাতাখানা জাল !"

"চুলোয় যাক খাতা," ভবতোষবাবু বললেন, "ওসব তোমার গোয়েন্দাগিরির প্যাঁচ, ওসব প্যাঁচ রাখো। খাতাটা জালই হোক আর আসলই হোক আমার মক্কেলের মাথার কী হবে ? তার সম্পত্তির কী হবে ?"

"সে সব পরের কথা," অশোক যেন তোড়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করল, এমন তোড়ে যে আর কেউ যাতে বাধা দিতে না পারে, "আপাতত কথা হল খাতাটা জাল এবং খাতাটা যে জাল এ সন্দেহ আমার মনে আসে যখন প্রথম খাতাটার চেহারা দেখলুম। দুশো বছরের পুরনো খাতার চেহারা অমন হতেই পারেনা।"

"তার মানে ?" কুনু প্রায় রুখে উঠল, "চেহারা দেখে ত বরং মনেই হয় খুব পুরনো, একেবারে ঝুরঝুরে পুরনো। ঠিক কত পুরনো তা কেমন করে হিসেব করব, কিন্তু পুরনো যে তাতে সন্দেহ নেই। পাতাগুলো একেবারে হলদে হয়ে গিয়েছে, কালির রঙ হয়েছে ফিকে-বাদামী ; এমন কি বাঁধাই—বাঁধানোটা দেখলেই বোঝা যায় কত দিনকার খাতা।"

"হুঁ," অশোকের গলা একেবারে অবিচলিত, "বেশ, বাঁধাই আর মলাটের কথাই প্রথম ধরো।" অশোক খাতাটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে লাগলো। "মলাট আর বাঁধাই খুব পুরনো মনে হচ্ছে, নয় ? হবার ত কথাই। যে চামড়া দিয়ে খাতাটা বাঁধানো তা অবশ্যই খুব পুরনো চামড়া। সন্দেহ নেই।"

"নিশ্চয়ই," কুনু বলল।

"কিন্তু এমন ত হতেই পারে যে খুব পুরনো চামড়া দিয়েই কেউ খাতাটা সম্প্রতি বাঁধিয়েছে। খুব পুরনো চামড়া বোম্বাই সহরে দুর্লভ নয় ; এখানে দরকার হলে, শুনেছি, এক ঘণ্টার মধ্যে বাঘের দুধ জোগাড় করা যায় আর খুব পুরনো চামড়া জোগাড় করা যায় না ?"

"তা না হয় যায়," কুনু বলল, "কিন্তু শুধুই ত পুরনো চামড়া নয়! দেখছ না, বইটার গায়ে, মলাটের ওপর, কত চিহ্ন রয়েছে ? এসব চিহ্ন যে ব্যবহারের চিহ্ন তা দেখলেই বোঝা যায়। কত দিন ধরে কত মানুষ বইটাকে ব্যবহার করেছে,

আলমারিতে রেখেছে, নেড়েছে-চেড়েছে-পড়েছে—তার সব চিহ্ন। এগুলোকে অস্বীকার করবে কেমন করে? এগুলোর মধ্যে যে ইতিহাসের স্পষ্ট পদচিহ্ন!"

"ঠিক বলেছিস। এগুলোকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবং উপায় নেই বলেই বাধ্য হলুম বইটাকে জাল বলে সন্দেহ করতে।"

"তার মানে?"

"মানে চিহ্নগুলো ঠিকই আছে তবে সবই ভুল জায়গায় রয়েছে। একটা বই খুব বেশিদিন ধরে ব্যবহৃত হলে ঠিক কোন-কোন জায়গায় ব্যবহারের চিহ্ন পড়া উচিত? প্রথমত, মলাটের নীচের দিকটা, যে দিকটা আলমারির সেলফ-এর সঙ্গে ক্রমাগত ঘসা খায়। তার পর, মলাটের কোণাগুলো; কেন না, সে জায়গাগুলোর চামড়া সবচেয়ে পাতলা আর এই কোণাগুলোর ওপরেই পড়ে সবচেয়ে বেশি ঝক্কি। তারপর, বইটাকে আলমারি থেকে টেনে বের করবার সময় বাঁধাই-এর মাথায় যে জায়গাটায় আঙুলের চাপ পড়ে সেই জায়গাটা। বইটার বাঁধাই-এর সূতো-গুলোও বারবার খোলা বন্ধ হওয়ার দরুণ ঢিলে হয়ে যাওয়া উচিত। পুরনো বই ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবি যে সামনের আর পেছনের মলাটের ওপর-দুটোই জখম হয় সবচেয়ে কম। কিন্তু এই খাতাটাকে যখন প্রথম দেখলুম তখনই আমার কতকগুলো সন্দেহ হল: দেখলুম এর মলাটের নীচের

দিকটা, কোণাগুলো এমন কি বাঁধাই-এর সূতোগুলো একেবারে খাসা রয়েছে। তবুও খাতাটার ওপর রয়েছে অনেক সব দাগ ; ব্যবহৃত হবার দাগ ; কিন্তু সবই এলোমেলো, অজায়গায়, কুজায়গায়। যেমন ধর, মলাটের ওপরের দাগগুলো, ওগুলো ব্যবহারের চিহ্ন নয়, ব্যবহারের ধাপ্পা। এক কথায় খাতাটা প্রাচীন নয়, পুরনো চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে ওকে যেন প্রাচীনতার মুখোস পরানো হয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।”

অশোক একটু থামলো।

কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

অশোক আবার বলে চলল, “তা ছাড়া, আর একটা কথা ত খুবই স্পষ্ট। এটুকু ত সকলেরই মাথায় আসা উচিত ছিল। দুশো বছর আগেকার খাতা, অথচ বাঁধাইটা একেবারে হাল ফ্যাসানের।”

“তার মানে ?”

“মানে দু'শো বছর আগে আমাদের দেশে এ জাতের বাঁধাই মোটে সম্ভবই নয়। দেখ না, বাঁধাই-যন্ত্রের অস্পষ্ট দাগ পর্যন্ত খাতাটার গায়ে, অথচ একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে দু'শো বছর আগে বাঁধাই-যন্ত্র আমাদের দেশে থাকা সম্ভবই নয়। তখন অধিকাংশ বই পাতায় লেখা হত, এবং পাতাগুলোর তাড়ি বাঁধাকেই যা বাঁধাই বলা যায় !”

"কিন্তু কাগজ ?" কুনু বলল, "কাগজটার চেহারা কি বাস্তবিকই খুব পুরনো নয় ?"

"তা অবশ্য ঠিক। এবং দু'শো বছর আগে চীন ও ইয়োরোপের কোনো-কোনো জায়গায় কাগজে লেখার প্রচলন সত্যিই হয়েছে! বাট্‌লিওয়ালা বংশের সঙ্গে জলদস্যুতার প্রবাদ যখন সংযুক্ত তখন এমন কথা মনে হতেই পারে যে অতদিন আগে প্রতাপচন্দ্রের কোনো পূর্বপুরুষের হাতে কোনো উপায়ে লেখার কাগজ এসেছিল। পাণ্ডুলিপিটা তাই পুরনো হতেই পারে যদিও বাঁধাইটা মাত্র হালের !"

"হুঁ। আমার ত এখন তাই মনে হচ্ছে।"

"মনে হবার আর একটা কারণ কালি—কালিটা কী রকম ফ্যাকাসে বাদামি দেখাচ্ছে !"

"হুঁ। তা ত বটেই।"

"এসব কথা আমি আগেই ভেবেছি। কিন্তু তবুও একটা সন্দেহ মন থেকে মুছতে পারিনি। যদি পাণ্ডুলিপিটা পুরনোই হয় এবং বাঁধাইটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হয় তা হলে পুরনো চামড়া দিয়ে বাঁধাই করারই বা দরকার কী আর সেই বাঁধাই-এর ওপর এলোমেলো দাগ ফেলে প্রাচীনতার ধাপ্পা দেবারই বা কী মানে হয় ? এ সবের পেছনেই একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি ?"

"উদ্দেশ্য যাই থাক, কাগজ আর কালি যদি বাস্তবিকই

নিষেধ

পুরনো হয় তা হলে বাঁধাই সম্বন্ধে তুই যত সন্দেহই করিস না কেন আসল পাণ্ডুলিপিকে কোনো মতেই জাল বলে চালাতে পারিস না।"

"ঠিক। তাই পরীক্ষা করে দেখতে হবে কাগজ আর কালি সত্যি পুরনো কিনা! এবং সে পরীক্ষা যতক্ষণ না শেষ করছি ততক্ষণ অবশ্যই তোরা কেউ কোনো রায় দিতে পারিস নে। তবে আমার মনে-মনে বিশ্বাস মলাটের ওপর যখন ধাপ্পা ধরা পড়েছে তখন কাগজ এবং কালির ওপরও ধাপ্পা আবিস্কৃত হবে।"

"কিন্তু ধাপ্পা কি না ধরবি কেমন করে?"

"তারই ত দাওয়াই কিনে এনেছি।" অশোক বলল, এবং তারপর দিদির দিকে ফিরে, "আমার সেই চামড়ার ছোট্ট বাক্সটা?"

দিদি উঠে গিয়ে বাক্সটা নিয়ে এলেন। অশোক প্যাকেট খুলে ওষুধগুলো টেবিলে সাজাল। তারপর ব্যাগটা থেকে ছোট ভাঁজ-করা চক-চকে একটা অণুবীক্ষণ বের করে টেবিলের ওপর ঠিক করে বসালো আর বের করল ড্রপার, সরু চিমটে, কাঁচের দু-একটা পাত্র।

টেবিলের ওপর তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ।

অশোকের চোখে কৌতূহল নেই। স্থির, শান্ত দৃষ্টি। সে যেন আপন মনেই বলে চলল:

"খাতার পাতাগুলোকে যে সন্দেহ করছি তার একটা স্পষ্ট

কারণ অবশ্যই রয়েছে। কাগজ পুরনো হলে হলদে হয়ে যায় বটে ; কিন্তু কোনো খুব পুরনো বই যদি ভালো করে লক্ষ্য করা যায় তা হলে চোখে পড়ে পাতাগুলোর সমস্তটাই সমান হলদেটে নয়। তার কিনারাগুলো বেশী হলদেটে, মাঝের দিকটা অনেক কম হলদেটে। এর কারণ অবশ্য—'' অশোক কথা বলছে আর সযত্নে ওষুধপাতি এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ গোছাচ্ছে —"এর কারণ অবশ্য স্পষ্ট : বইটা যখন বন্ধ করা থাকে তখন পাতাগুলোর ভেতর দিকটায় হাওয়া লাগে না, কিনারগুলোতেই হাওয়া লাগে। আর হাওয়ার মধ্যে যে অক্সিজেন আছে তার ফলেই কাগজ অমন হলদে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। অথচ, এই খাতাটার প্রত্যেকটা পাতার সমস্ত অংশই সমান হলদে, ঝুরঝুরে !"

"তার কারণ অবশ্য এও হতে পারে যে খাতাটার পাতাগুলো বহুদিন আবাঁধাই অবস্থায় খোলা পড়েছিলো—তখন পাতাগুলোর পুরো অংশ সমান হাওয়া খেয়ে সমান হলদে হয়ে গিয়েছে !"

"হতে পারে বই কি ! কিন্তু এও ত হতে পারে ফিকে চায়ের জলে ডুবিয়ে পাতাগুলোকে পুরনো হলদেটে দেখতে করা হয়েছে !"

"তাও কি সম্ভব নাকি ?"

"খুব সম্ভব। আসলে যে ব্যাপারটা কী তা একটু পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারা যাবে।"

ততক্ষণে অশোকের তৎপর হাতের গুনে টেবিলের ওপর একটা ছোট্ট স্পিরিট ল্যাম্প জ্বলছে। একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে পরিষ্কার জল ঢেলে এবং তার মধ্যে খাতাটা থেকে একটুকরো ছোট্ট কাগজ ছিঁড়ে দিয়ে অশোক স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে সেটা ফোটাচ্ছে।

তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ টেবিলের ওপর।

অশোকের চোখে কৌতূহল নেই। স্থির, শান্ত, দৃষ্টি।

একটু চুপচাপ।

কাগজটা বেশ একটু ফোটবার পর অশোক সাবধানে সরু চিমটের ডগায় সেটা তুলে নিল। তারপর এক টুকরো চৌকো কাঁচের ওপর সেদ্ধ কাগজের টুকরোটা ফেলে একটা লম্বা ছুঁচ দিয়ে সেটা বেশ করে পিঁজে ফেলবার মতন করল। তারপর একটা শিশি থেকে একফোঁটা গাঢ় রঙের তরল জিনিষ তুলে তার ওপর ফেলল।

"ওটা কী ওষুধ রে?" কুমু প্রশ্ন করল।

"ওষুধ-টষুধ নয়। এর নাম এ্যানিলাইন্ স্টেন্। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখবার সুবিধে হবে।" বলতে বলতে অশোক সবুজ সুটকেশ থেকে একটুকরো ব্লটিং কাগজ বের করে কাঁচের ওপর থেকে বাড়তি রঙটা শুষে নিলো। তারপর আর একটা শিশি থেকে আর এক ফোঁটা কি ফেলল সেদ্ধ আর পেঁজা কাগজের টুকরোর ওপর।

"ওটা আবার কি ?"—কুমু আবার প্রশ্ন করল।

"গ্লিসারিন।" বলতে বলতে অশোক আর এক টুকরো চৌকো কাঁচ প্রথমটার ওপর সাবধানে টিপে বসালো।

তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ টেবিলের ওপর। অশোক সাবধানে কাঁচের টুকরো দুটো মাইক্রোস্কোপে ভরে দিলো এবং তারপর এক চোখ বন্ধ করে নলের ওপর দিককার ফুটোর মধ্যে আর এক চোখ বসালো।

কারুর মুখে কথা নেই।

স্তব্ধতা ভাঙলো অশোকই, "যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। কাগজটা একেবারে আধুনিক কাগজ।"—বলতে বলতে অনু-বীক্ষণ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো।

"কেমন করে বুঝলে ?"—এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন দিদি।

"কঠিন নয়। তুমিই একবার চোখ দিয়ে দেখ। স্পষ্ট দেখতে পাবে কাঠের টুকরো, বাঁশের টুকরো, ছেঁড়া কাপড়, পেঁজা তুলো—এই সব। এসব জিনিষ দিয়ে কাগজ তৈরি মাত্র শ খানেক বছর হল চালু হয়েছে। ১৮৪০-এ কেলার বলে একজন ইয়োরোপীয়ান্ বাঁশ এবং কাঠ থেকে কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি চালু করেন ; এ পদ্ধতির তাই নাম কেলার-পদ্ধতি। তাহলে বুঝতেই পারছো, খাতাটার বয়স দুশো বছর হতেই পারে না, কেন না মাত্র একশো বছর আগে এইভাবে কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি পৃথিবীতে এসেছে। আমার ত মনে হচ্ছে কাগজটা

খুবই আধুনিক ; কেন না ওর মধ্যে আর একটা জিনিষ রয়েছে যাকে বলে esparto—সে জিনিস দিয়ে তৈরি কাগজের চল খুব বেশীদিন হয়নি। তাই বলছিলুম, কাগজটা যে হলদে হয়েছে তা বয়সের দরুণ নয়, খুব সম্ভব চায়ের জলে চান করার দরুণ।"

"কিন্তু লেখার কালি?"

"হুঁ। লেখার কালিও পরীক্ষা করে দেখতে হবে বই কি। যে রকম বাদামি রঙ তাতে ত মনে হয় যে খুবই সেকেলে!"

ফুঁ দিয়ে অশোক স্পিরিট ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলো আর অণুবীক্ষণটা সযত্নে বন্ধ করে রাখলো চামড়ার ব্যাগে।

"এবার কালিটা নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। তবে, তার আগেই নিজের একটা অপকর্মের কথা স্বীকার করে নিচ্ছি।" বলতে বলতে বুক পকেট থেকে সযত্নে অশোক একটা খাম বের করল এবং সেই খামের থেকে বের করল একটা পুরোনা চিরকুট। "এটা", অশোক বলল, "সত্যিই খুব পুরোনো চিরকুট। আমি চুরি করে এনেছি।"

"চুরি!" একসঙ্গে তিনটে বিস্মিত গলার ঐক্যতান।

"হুঁ," অত্যন্ত সহজ গলা অশোকের, "অধ্যাপক ত্রিবেদী যখন তন্ময়ভাবে এই খাতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন তাঁর লাইব্রেরীর তাক থেকে হাত সাফাই করে এনেছি।"

"কিন্তু এটা কি তোর উচিত হল?"—কনু অত্যন্ত গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, যেন ইস্কুলের মাস্টারমশাই নীতিশিক্ষা পড়াচ্ছেন।

"না, সত্যি উচিত হয়নি", অম্লান বদনে বলে চলল অশোক, "কিন্তু উপায়ও যে ছিলো না। সত্যিকারের দুশো বছরের পুরোনো চিরকুট এই বিদেশ-বিভূঁয়ে পাই-ই বা কোথায়? তা ছাড়া, একে ঠিক চুরি বলতেও পারিস না, কারণ পরীক্ষা হয়ে গেলেই ফেরত দিয়ে আসব।"

"কিসের পরীক্ষা?"

"এই দেখ না। শ দুয়েক বছর আগে এক রকম কালি মানুষ ব্যবহার করত বলে জানি যে কালির মধ্যে iron-sulphite বলে একটা জিনিস আছে। সে কালি সত্যিই পুরনো হলে বাদামি হয়ে যায়। ত্রিবেদীর ঘর থেকে যে চিরকুটটা এনেছি তার লেখাগুলো বাদামি হয়ে রয়েছে। প্রথম আমি পরীক্ষা করে দেখবো এই চিরকুটের লেখাগুলো iron-sulphite-এর কালির কিনা। যদি তাই হয় তাহলে প্রামাণিত হবে প্রাচীন গুজরাটে ও কালির প্রচলন ছিলো এবং তাহলে আশা করতে হবে এই খাতার কালিও একই জাতের। তারপর দেখব খাতার কালিতে iron-sulphite আছে কিনা।"

"আছে কিনা বুঝবি কী করে?"

"যদি iron-sulphite থাকে তাহলে লেখার ওপর একফোঁটা এ্যামোনিয়াম সালফাইট্ ফেললেই ধরা পড়বে। দেখ না।"

তারপর অশোক অত্যন্ত স্থির হাতে একটা বোতল থেকে ড্রপারে করে তুলল একটু আরক এবং ত্রিবেদীর ঘর থেকে আনা

চিরকুটের এক কোণায় একটা অক্ষরের ওপর ফেলল একফোঁটা সেই আরক।

তিন জোড়া উদ্‌গ্রীব চোখ চিরকুটটার ওপর।

দেখতে দেখতে চিরকুটের অক্ষরটা একেবারে মিশমিশে কালো হয়ে গেল।

অশোক সেটা'ক সাবধানে টেবিলের এক কোণায় সরিয়ে রাখলো আর তারপর খাতাটার একটা পাতা খুলে একটা অক্ষরের উপর আবার এক ফোঁটা আরক ফেলল।

তিনজোড়া উদ্‌গ্রীব চোখ টেবিলের উপর।

কিন্তু খাতার ফিকে বাদামি অক্ষর গভীর কালো হয়ে উঠল না। বরং, আরও ফিকে হয়ে অস্পষ্ট বেগুনি রঙ হয়ে গেল।

এতক্ষণে পাতলা হাসি দেখা দিলো অশোকের মুখে। হালকা চুলগুলো কপালের ওপর থেকে পেছুনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে তুটো কনুই-এর ভর দিলো টেবিলের ওপর। ভবতোষবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "জেরা শেষ করেছি। এবার আপনার হাকিমী রায় দিন।"

ভবতোষবাবু সেই যে তখন তুগালে একসঙ্গে ছটা পান পুরেছিলেন এতক্ষণ তা চিবোতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তন্ময় হয়ে শুনছিলেন অশোকের কথা। যেন হুঁস ফিরে এলো। একসঙ্গে কচমচ করে চিবোতে সুরু করলেন সেই ছটা পান। আর তারপর বলে চললেন—

"বাস্তবিক আশ্চর্য ! অশোক, তুমি যে এত জানো, অমন খুঁটিয়ে ভেবে দেখো তা আমি কল্পনাও করতে পারতুম না। বুদ্ধির খেলায় তোমার সঙ্গে পারা মনে হচ্ছে অসম্ভব : তুমি যদি উকিল হতে তাহলে নিশ্চই অসাধারণ ভালো উকিল হতে। যদি তুমি ডাক্তার হতে—"

"কিন্তু", অশোক বাধা দিলো, নিজের প্রশংসা শুনতে সত্যিই বড় অস্বস্তি হয়। "কিন্তু, আমি উকিলও নই, ডাক্তারও নই। আমি হলুম—"

"জানি আমি। তবে যদি উকিল হতে, অন্তত আইন সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকত তাহলে সত্যিই বড় ভালো হত। সে জ্ঞান নেই বলেই তোমার এত আশ্চর্য্য পরীক্ষা সবই বিফল হল।"

"তার মানে ?"

"একটু ঠাণ্ডাভাবে ভেবে দেখো", ভবতোবাবু বললেন, "আমাদের আসল সমস্যাটার দিক থেকে ভেবে দেখবার চেষ্টা করো। আসল কথা হচ্ছে আইনের কথা : প্রতাপচন্দ্রের যদি বাস্তবিকই মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। উইলে এমন কথা নেই যে একটা খাঁটি-খাতা দেখে এই মাথা খারাপ হওয়া দরকার। মাথা যদি খারাপ হয় তা হলেই হল ; তা আসল খাতা দেখেই হোক আর নকল খাতা দেখেই হোক—তফাৎ কিছুই হয় না। তুমি যদি এর বদল

উদয়চন্দ্রর—প্রতাপচন্দ্রের কাকার—উইলটাকে এইভাবে নকল বলে প্রমাণ করতে পারতে তাহলে না হয় একটা হিল্লে হত।"

"ঠিক বলেছেন," অশোক অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, "আপনি বলতে চান সাপ দেখে ভয় পাওয়া আর দড়িতে সাপ দেখে ভয় পাওয়া দুইই একদিক থেকে এক কথা—নিছক ভয় পাওয়ার দিক থেকে। এই ত ?"

"হুঁ। তাই নয় কি ?"

"নিশ্চই।"

"আমাদের উদ্দেশ্যটার কথা ভুললে ত চলবে না। কী বলো ?"

"নিশ্চই। আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রতাপচন্দ্রকে বাঁচানো, কিম্বা তাঁর সম্পত্তি বাঁচানো—এই ত ?"

"হুঁ। তাই নয় কী ?"

"নিশ্চই।"

"তা হলে ?"

"তাহলে চলুন সেই চেষ্টাই করা যাক। কুনু, যাবি নাকি সঙ্গে ?"

"কোথায় ?"

"উদয়-ভবন। প্রতাপচন্দ্রের বাড়ি। পথে শুধু একবার ত্রিদেবীর চিরকুটটা ফেরত দিয়ে যেতে হবে।"

"আমি প্রস্তুত।"—কুনু বেশী কথা বলছে না। ওরও নেশা ধরছে বোঝা যায়।

"তাহলে চলুন ভবতোষদা, প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে আলোপ করিয়ে দেবেন চলুন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চলে যেতে হবে

অশোক, কুন্নু আর ভবতোষবাবু যখন উদয়-ভিলার সামনে পৌঁছোলেন তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। আকাশে আলো ম্লান হয়ে এসেছে, আর সেই ম্লান আলোয় সমুদ্র আর পিচের পথ, কালো এবড়ো খেবড়ো পাথর আর দূরের ঝাপসা তাল-গাছের বন—যেন কি রকম মৃত অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

কারুর মুখে কথা নেই। দেউড়িতে দরোয়ান উঠে দাঁড়াল, অভিবাদন জানাল—কিন্তু নিঃশব্দে।

তারপর প্রকাণ্ড প্রাসাদ। অথচ কি রকম যেন খাঁ খাঁ করছে। বড় বড় ঘর। আসবাবের বিন্দুমাত্র অভাব নেই। বরং বাহুল্যই। অথচ কিসের অস্পষ্ট অভিশাপ যেন বোবা উদ্ধত ভঙ্গিতে স্তব্ধভাবে পাহারা দিচ্ছে। এখানে মৃত্যুর হাওয়া। এখানে জীবনের কোন স্থান নেই। অগন্তুকের দল অনধিকার প্রবেশ করেছে মনে হয়।

কোথাও কিছুমাত্র শব্দ নেই। শুধু তিনজনের পায়ের শব্দ। কি রকম খাপছাড়া, কি রকম অবাঞ্ছনীয় মনে হয় এই পায়ের শব্দ। সেই শব্দে কেঁপে উঠছে সমস্ত বাড়ির স্তব্ধতা—যেন সূর্যপূজারীর অভিশাপের মূক সাক্ষীর কপাল কুঁচকে উঠছে!

অলৌকিককে কুন্তু মানে না। ভয় বলে কোন জিনিসকে সে জীবনে চিনতে শেখেনি। তবুও একটা বোবা অস্বস্তিতে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল স্তব্ধতার এই অখণ্ড রাজত্ব ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলতে।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে এর কোন মানেই হয় না। ফাঁকা বাড়ি। লোকজন নেই। এই যা। তবুও ইতিহাস? এই বাড়ির, এই বংশের পেছনে যে অদ্ভুত ইতিহাস রয়েছে সেই ইতিহাসকে কেমন করে অস্বীকার করা যাবে? হয়ত অলৌকিক কিছুই নয়। হয়ত কেন, নিশ্চয় কিছুই নয়। কেননা সে রকম হতেই পারে না—কুন্তু মনে মনে নিজের সঙ্গে তর্ক করে। তবু সেই ইতিহাস, সূর্যপূজারীর সেই অভিশাপ—সে যেন বাড়ির ধূলোকণার মধ্যে বোবা সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে। এ ইতিহাসকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়—এ ইতিহাস যে দুঃস্বপ্নের মতন সমস্ত বাড়িময় থমথম করছে।

কোথাও বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। যেন জীবনের সীমানা পার হয়ে মৃত্যুর মৌনতার মধ্যে পা ফেলতে ফেলতে তিনজনে এগিয়ে চলেছে। কারুর মুখে কথা নেই, কুন্তুর মনে নানান রকম কথা তোলপাড় করছে। আর একটা অস্বস্তি—ভয় নয়, একটা অদ্ভুত অস্বস্তি—দুঃস্বপ্নের মতো, বুকচাপার মতো। কারণ নেই, তবুও নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়; মনে হয় এই স্তব্ধতাকে অমনভাবে ভেঙে এগিয়ে চলা বুঝি উচিত হচ্ছে না। ভাবতে

গেলে হাসি পায়, হাসি পাবারই কথা। কিন্তু এই অভিশপ্ত প্রাসাদ রক্তে কিসের ঢেউ তোলে ; বুদ্ধির বাঁধ সে ঢেউতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কুন্নু ভালো করে, পরিষ্কার ভাবে ভেবে দেখবে কেমন করে ?

ভবতোষবাবু চলেছিলেন সব প্রথম। এ বাড়ির ঘরদোর তাঁর চেনাশুনো, পরিচিত। তারপর অশোক। অশোকের মনের মধ্যে কী রকম ভাব তা মুখ দেখে মোটেই বোঝবার উপায় নেই। কেননা, অশোকের মুখের উপর মনের ভাব কোনদিনই কোন ছায়া ফেলতে পারে না। শুধু ওর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো চক-চক করে। কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়। ওইটুকুই।

"ডানদিকে লাইব্রেরি-ঘর," হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে ভবতোষ-বাবু বললেন, কি রকম খাপছাড়া মনে হল তাঁর গলার স্বর, "এই ঘরেই সম্ভবত তাঁকে পাওয়া যাবে।"

কাকে ? বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধেই কথাটা তিনি বললেন। কেন না, প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তিনজন এখানে উপস্থিত। "কে জানে এখন কেমন অবস্থায় আছেন," ভবতোষবাবু প্রায় আপন মনেই বললেন, "একে মাথা খারাপ, তায় সম্প্রতি খুব আফিম ধরেছেন।"

কুন্নু বা অশোক এ কথার জবাব দিল না। জবাব আছেই বা কি ?

ভবতোষবাবু লাইব্রেরির দরজার ওপর সন্তর্পণে টোকা দিলেন। ভিতর থেকে শব্দ এল, "ভেতরে আসুন।"

দোর ঠেলে ঢুকলেন ভবতোষবাবু, তারপর অশোক, তারপর কুমু।

প্রকাণ্ড ঘর। একেবারে কড়িকাঠ পর্যন্ত ঠাসা বই। দক্ষিণ দিকের জানলাটা খোলা, তার মধ্যে সমুদ্রের একফালি নজরে পড়ে। সমুদ্রের ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত সমুদ্র রক্তাক্ত।

আর সেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একটি শীর্ণ পুরুষ। আস্তে আস্তে সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফেরোলো, তারপর চোখের চশমাটা খুলে পকেট থেকে ধবধবে রুমাল বের করে চশমার কাঁচ মুছতে লাগল।

সূর্যাস্তের আলোয় চশমার পুরু কাঁচ চকচক করে উঠল।

লোকটি চশমাটা আবার চোখের ওপর দিল, তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা নিস্তেজ গলায় বলল, "আসুন।"

ভবতোষবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন।

প্রতাপচন্দ্রের মুখে ফুটে উঠল দুর্বল ফিকে হাসি। "আমাদের দেশে এলেন," প্রতাপচন্দ্র অশোক আর কুমুকে উদ্দেশ করে বলে চললেন, "কিন্তু এমন সময় এলেন যখন আমার শেষ হয়ে এসেছে। আমার শেষ হয়ে এসেছে, আমার সময় নেই—নইলে আপনাদের মতো অতিথিদের নিয়ে কত আনন্দই করতে পারতুম। এই সহর, এই সমুদ্র—এদের আমি কী ভালো

যে বাসি তা কেমন করে বলব! অথচ, আমার শেষ হয়ে এসেছে, আমায় চলে যেতে হবে—এই সহর, এই সমুদ্র ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে ; আমার সময় হয়ে এলো।”

প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন। কেমন যেন হাঁপিয়ে পড়েছেন মনে হল। তারপর আস্তে আস্তে নীচু টেবিলের একটা দেরাজ থেকে ওষুধের একটা শিশি বের করে একটা ছোট্ট গেলাসে কি ঢাললেন ; তারপর ঢক করে গিলে ফেললেন।

নিশ্চয়ই বিস্বাদ ওষুধ। তাঁর ফ্যাকাশে মুখ কি রকম বিকৃত হয়ে গেল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঠোঁট মুছতে মুছতে প্রতাপ-চন্দ্র আবার এগিয়ে গেলেন পশ্চিমের জানলটার দিকে, আর বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইলেন জানলার বাইরে।

বাইরে সমুদ্রের ওপর লাল সূর্যাস্ত। সমস্ত সমুদ্র রক্তাক্ত মনে হয়।

আর সমুদ্র থেকে ঠিকরে-আসা লালচে আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল তাঁর চোখছুটো চকচক করছে।

চোখের কোণে জল !

এ অবস্থায় কী-ই বা বলা যায় ! ছেলেমানুষ নয়, বোকাহাবা নয়—তবুও যদি অমন ছেলেমানুষি করে তা হলে তাকে কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে ?

কুনু দাঁড়িয়ে রইল বিহ্বল ভাবে।

ভবতোষবাবু এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, "আপনি অনর্থক বিচলিত হয়েছেন প্রতাপচন্দ্র।"

প্রতাপচন্দ্র হাসলেন। আবার সেই দুর্বল ফ্যাকাশে হাসি। "এটা যে তর্কের বিষয় মোটেই নয় ভবতোষবাবু," প্রতাপচন্দ্র বলে চললেন, "আমি দর্শনের ছাত্র, আমি তর্ক-বিদ্যার শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখেছি। যদি তর্কের বিষয় হত তা হলে আমি তর্ক করতুম, হয়ত আপনাদের কাছে হার মানতুম না।"

প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন। তারপর যেন আচমকা একটা উত্তেজনার ঢেউ এল তাঁর মধ্যে, তাঁর ক্ষীণ সরু সরু আঙুল-গুলো অস্থিরভাবে ঘুরতে লাগল পাশের টেবিলটার ওপর—

"আমি নিজে দেখছি। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার। প্রথমে অবিশ্বাস করেছি নিজের চোখ, প্রথমে আমল দিইনি অলৌকিক কোন কথা। কিন্তু একবার নয়, দুবার নয়—বারবার। সূর্যপূজারীর অভিশাপ আমার সামনে সমন পাঠিয়েছে। এ সমনকে নিজের চোখে দেখতে পেয়ে—একবার নয় দুবার নয়, বারবার দেখতে পেয়েও আমি কেমন করে অস্বীকার করতে পারি? এখন নিজের সঙ্গে তর্ক করা বন্ধ করেছি—এখন আমি বুঝতে পেরেছি এ জিনিস তর্কের বিষয় নয়। সূর্যপূজারীর অভিশাপ আমার সমস্ত জ্ঞান, আমার সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে মিথ্যে করে দিয়েছে। আমি আর নিজের সঙ্গে তর্ক করি না……"

রোগা দুর্বল শরীরে যেন শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছিল। দম নেবার জন্যে প্রতাপচন্দ্র আবার থামলেন। সমুদ্র থেকে ঠিকরে-আসা সূর্যাস্তের আলোয় তাঁর চোখদুটো কী রকম অসহায়, কী রকম করুণ মনে হচ্ছিল।

ভবতোষবাবু তাঁর কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। অনেকটা সান্ত্বনা দেবার সুরেই তিনি আবার বললেন, "আপনি অনর্থক বিচলিত হয়েছেন, প্রতাপচন্দ্র। একটা খবর বোধ হয় আপনি জানেন না—যে খাতায় সূর্যপূজারীর অভিশাপের কথা রয়েছে সে খাতাটা জাল বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।"

প্রতাপচন্দ্রের পাতলা ঠোঁটে আবার ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। এ হাসি তাঁর চোখের কোণায় জলের চেয়ে করুণ, তার চেয়েও অসহায়।—"জাল বলে প্রমাণ হয়েছে?"—প্রতাপচন্দ্র প্রশ্ন করলেন! কিন্তু প্রশ্নের সুরে এতটুকু উৎসাহের সাড়া নেই।

উৎসাহ বরং ভবতোষবাবুর গলায়, "হুঁ। জাল। কলকাতার একজন বিশিষ্ট অপরাধ-বিজ্ঞানী বিচার করে দেখিয়েছেন যে খাতাটা মোটেই প্রাচীন নয়, তার ওপর প্রাচীনতার মুখোস পরানো হয়েছে মাত্র।"

"কিন্তু তাতে প্রমাণ হল কী?"—তার্কিক প্রতাপচন্দ্র যেন বহুদিন পরে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসলেন, "খাতাটা আসলে পুরনো নয়, অনেক ভুলচুকে ভরা খাতা—এ আমি অনেকদিন আগেই জানতুম। প্রথম যখন ওটার পাতা ওলটাই তখনই

আমি দেখতে পেয়েছিলুম ওর মধ্যে নানান রকম ভুল কথা আছে, প্রাচীন গুজরাটের ইতিহাসের সঙ্গে যা একদম মেলে না। গোয়েন্দার দরকার কি বলুন—খাতার পাতায় যে কাগজ তা ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পৃথিবীতে প্রস্তুত হতে পারে না, খাতায় যে কালিতে লেখা তা মোটেই পুরনো কালি নয়। আর অত কেন, খাতাটার বাঁধাই দেখলেই বুঝতে পারা যায় ও খাতা প্রাচীন নয়। দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে বাঁধাই-এর যে জায়গায় চিহ্ন পড়া উচিত ও খাতার সে-সব জায়গায় চিহ্ন নেই, ভুল কয়েকটা দাগ পড়েছে মাত্র।”

কুনু যেন এক মুহূর্তে নিভে গেল। পাগল দেখতে এসে এ কী কাণ্ড! কিছুক্ষণ আগে যে কথা আবিষ্কার করার দরুন অশোকের প্রতি মনে মনে সে শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়েছিলো, সে কথাই কিনা এই দুরন্ত পাগল অতি অনায়াসে, গড় গড় করে, প্রায় মুখস্থ বলার মতো বলে গেল। খাতাটা আসলে পুরনো নয়, প্রাচীনতার কয়েকটা ভ্রান্ত ইঙ্গিতে মোড়া মাত্র—এ কথা আবিষ্কার করার মধ্যে বুদ্ধিভ্রংশের প্রমাণ ত দূরের কথা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তির প্রমাণ রয়েছে বরং। তা হলে ?

এতক্ষণ পরে অশোক প্রথম কথা বলল: “খাতাটা যে বাস্তবিক পুরনো নয় এ কথা তা হলে আপনি অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন ?”

"হুঁ", অত্যন্ত সহজ গলায় বললে প্রতাপচন্দ্র, "যেদিন প্রথম হাতে পাই সেই দিনই।"

"তাহলে খাতাটাকে অতখানি বিশ্বাস করলেন কেমন করে ?"

"খাতাকে বিশ্বাস ? কই খাতাকে ত আমি প্রাচীন বলে বিশ্বাস করিনি ! আমি বিশ্বাস করেছি নিজের চোখ-কে। খাতাটা আমার হাতে পৌঁছোবার আগেই প্রেতলোকের প্রতীককে দেখতে পেলুম, দেখতে পেলুম মৃত সূর্যপূজারীর সমন আমায় ডাকতে এসেছে। তারপর খাতাটা আমার হাতে এলো : বুঝলুম এটা আসল নয়, তবুও এর ভেতরের খবরটুকু আসল। মনে হল আমাদের বংশের কেউ—খুব বেশিদিন আগে নয় হয়ত—এই খাতায় আমাদের বংশের অতীত অভিশাপের কথা লিখেছিলেন। ঘটনা যখন ঘটেছে খাতাটা যে তখনকারই হতে হবে তার কোন যুক্তি নেই।"

"নিশ্চই নয়," অশোক বলল, "কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন : খাতাটা যাতে দেখতে পুরনো লাগে লেখক সে চেষ্টা করলেন কেন ?"

অশোকের প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের চেহারা যেন বদলে যেতে লাগলো। একটা আকস্মিক চাপা উত্তেজনা হঠাৎ যেন তাঁর দুর্বল ফ্যাকাশে চেহারার ওপর কালো ছায়ার পর্দা টেনে দিল। কয়েক মুহূর্ত তিনি চুপ করে রইলেন, তারপর ভবতোষবাবুর দিকে চোখ তুলে

চাইলেন। সে চোখ স্থির, শান্ত, অথচ তার আড়ালে একটা তীব্র ভৎর্সনা।

"ভবতোষবাবু," প্রতাপচন্দ্রের গলা এমন স্থির, এমন শান্ত, যে প্রত্যেকটি শব্দের টুকরোকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ মনে হয়, "ভবতোষবাবু, আলাপ করিয়ে দেবার সময় আপনি বললেই পারতেন আমায় জেরা করবার জন্যে আপনি এই অপরাধ-বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে এনেছেন। অবশ্য এতে যে অন্যায় কিছু আছে তা আমি বলতে চাই না; আর আনবেন না-ই বা কেন? সহর শুদ্ধু সকলেরই যখন ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তখন ত আমার যাঁরা মঙ্গলাকাঙ্খী তাঁরা সকলেই সব রকম চেষ্টা করবেন। এতে দোষের কিছু নেই; বরং আমার প্রতি মমতারই প্রকাশ রয়েছে। তবে একটা কথা বিশ্বাস করুন: আমার মাথা খারাপ যদিই বা হয়ে থাকে তা হলেও এতখানি খারাপ নিশ্চয়ই হয়নি যে ওঁকে অপরাধ-বিজ্ঞানী বলে পরিচয় করিয়ে দিলে আমি দুঃখিত হতুম।"

কনু আর ভবতোষবাবু একেবারে স্তম্ভিত!

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে অশোক বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে ভবতোষবাবুর বা আমাদের কারুর বাস্তবিক কোন দোষ নেই। কেন না, আপনার এখানে আসবার আগে পর্যন্ত আমাদের কারুর ধারণাই ছিলো না যে আপনার বুদ্ধি এখনো ঝকঝকে নির্মল রয়েছে। আজ সকালের কাগজ

আমরা পড়েছি ; হয়ত আপনিও পড়েছেন এবং আপনিই বলুন যে ভাবে তারা খবর ছাপিয়েছে তাতে আমাদের সকলের পক্ষেই শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক কি না। যাই হোক, খবরটা যে মিথ্যে এ দেখে আমরা সকলেই আশ্বস্ত হয়েছি।"

"তা হলে আমার মাথা যে খারাপ হয়নি এ কথা আপনি বিশ্বাস করছেন ?"

"নিশ্চয়ই"—অশোক খুব জোর দিয়েই বলল।

"ধন্যবাদ," প্রতাপচন্দ্র বললেন।

আর কথা নয়।

তারপর সমস্ত ঘরে একটা চাপা অস্বস্তির স্তব্ধতা। কারুর মুখে কথা নেই। কী-ই বা এখন বলা যায় !

সন্ধে হয়ে আসছে। সমুদ্র আরও টকটকে, আরও রক্তাক্ত মনে হয়। আর মনে হয় সমুদ্র থেকে ঠিকরে-আসা মৃদু লাল আলো সমস্ত ঘরের আবহাওয়াকে বড় বেশি গুমোট করে তুলছে।

কারুর মুখে কথা নেই।

কিন্তু এমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলে ত আর চলবে না। অশোক আস্তে আস্তে প্রতাপচন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেল। প্রতাপচন্দ্র জানলার বাইরে চেয়ে কী যেন ভাবছেন।

"শুনুন প্রতাপচন্দ্র," অশোকের গলা অত্যন্ত কোমল অথচ অত্যন্ত দৃঢ় মনে হল, "আমি সত্যিই অপরাধ-বিজ্ঞানী হিসেবে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"অপরাধ বিজ্ঞানের আওতায় আমার কেস-টা একেবারেই পড়ে না অশোকবাবু। আপনাকে ছোট করতে চাইছি না ; কিন্তু প্রেতলোক সম্বন্ধে অজস্র তথ্য জেনে আমি অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছি যে এ ব্যাপার অপরাধ বিজ্ঞানের বাইরে। আমায় সাহায্য করবার যে চেষ্টা করছেন তার জন্যে ধন্যবাদ ; কিন্তু আমার পূর্বপুরুষের কুকীর্তির যে ঋণশোধ আমায় করতেই হবে সে ব্যাপারে আপনার একটুও হাত থাকতে পারে না। আপনি বৃথা সময় নষ্ট করবেন না।"

"কিন্তু প্রেতলোকই যে আমি স্বীকার করি না।"

"তাতে প্রেতলোকের কিছুই আসে-যায় না।"

"প্রেতলোককে আমি অস্বীকার করি কেন না এ পর্যন্ত জীবনে তার কোন প্রমাণ পাইনি।"

"আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। আপনার বংশে কোনো অতীত কুকীর্তি নেই। ঈর্ষা করার মতো মনের জোর থাকলে আপনাকে আমি ঈর্ষা করতুম। কিন্তু সে জোর আমার আর নেই ; আমার সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। আমি শুনেছি প্রেতের আহ্বান।"

"সেই কথা বলুন। আমায় আগাগোড়া বলুন।"

"কিন্তু লাভ কী ?"

"আর কোন লাভ থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত আমার নিজের মস্ত বড় ভুল ভাঙতে পারে। প্রেতলোক সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আমি যেমন খারাপ মনে করি প্রেতলোক সম্বন্ধে ভ্রান্ত

অবিশ্বাসকেও আমি তেমনি খারাপ মনে করি। আমার অবিশ্বাস যদি ভ্রান্তই হয় তা হলে আপনার উচিত তা ভেঙে দেওয়া।"—অশোকের গলায় ক্রমশ একটা আদেশের সুর ফুটে উঠতে লাগল।

"কিন্তু তর্ক করতে আর ভালো লাগে না। নিজের সঙ্গে অনেক দিন অনেক তর্ক করেছি; ক্লান্তি লাগে—তর্ক করতে আর ইচ্ছে করে না।"

"আমি তর্ক করতে চাই না।"

"তবে কী চান?"

"যা ঘটেছে তাই শুনতে চাই।"

"সে সব কথা ভবতোষবাবুকে আগেই বলেছি। তাঁর কাছ থেকেই শুনতে পারেন।"

"উঁহু। আমি এমন কয়েকটা কথা শুনতে চাই ভবতোষবাবু যা জানেন না।"

"বলুন কী কথা?"

"প্রথম কথা, আপনি প্রথম কোথায় প্রেতলোকের সাক্ষাৎ পেলেন?"

"আমার ড্রেসিং রুমে।"

"সে ঘরে কটা দরজা জানলা?"

"মাত্র একটা দরজা—আমার শোবার ঘর থেকে ঢোকবার দরজা। ঘরটার বাকি তিন দিকে একেবারে ঠাস ইঁটের গাঁথনি।"

"কী দেখলেন বলুন।"

"খুলেই বলছি। ঘরটায় ঢোকবার দরজার ঠিক মাথার ওপর একটা ইলেকট্রিক আলো আছে। আমার শোবার ঘর থেকে কয়েক ধাপ নেমে ডানদিকে আলোর সুইচটা পড়ে। সেদিন রাতে শোবার আগে জামা কাপড় বদলাবার জন্যে ড্রেসিংরুমে নামছি, সামনে দোরটা বন্ধ ছিল। দোরটা খুললুম। ঘর অন্ধকার। মনে হল অন্ধকার থেকে একটা বাদুড় উড়ে বেরিয়ে গেল। এমনিতে অবাক হবার কিছু নেই; কিন্তু সে বাদুড়টা অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত। তার গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে নীলচে আলো। অবাক হয়ে ফিরে চাইলুম। কিন্তু বাদুড়টাকে আর দেখতে পেলুম না। মনে হল মনের ভুল হয়ত বা। তাই মন থেকে ও কথা মুছে ফেলতে ফেলতে ডানদিকের সুইচটা টিপলুম। আর চমকে উঠলুম। ঘরের মধ্যে আমার ঠিক মুখোমুখি একটা মাথা উলটো হয়ে শূন্যে ভাসছে। আমি কিন্তু ভয় পাইনি। একটুও নয়। লাফিয়ে ঢুকলুম ঘরের মধ্যে। অন্ধকার ঘর; বাইরের দোরের ওপরের আলোটা চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে পৌঁছোয় না। কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্য আলো আছে। তাড়াতাড়ি তার সুইচ টিপে ভেতরের আলো জ্বাললুম। কিন্তু আশ্চর্য; আলোয় ঘর ভরে উঠলে ভেতরে শুধু আমার ওয়ার্ডরোব আর ড্রেসিং টেবিল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।"

"অথচ ইতিমধ্যে যে ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে গিয়েছে তাও মনে হল না?"

"হতেই পারে না; কেন না, ঘরে ঢোকবার মাত্র একটি দরজা, এবং সে দরজা জুড়ে ঢুকেছি আমি নিজে। কোনো কিছু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে আমায় ধাক্কা না দিয়ে বেরুতেই পারে না।"

"তারপর আপনি কী করলেন?"

"বলছি শুনুন। সেদিন আর বিশেষ কিছু করিনি। কেবল, মনটা কি রকম যেন ছমছম করতে লাগল। শোবার ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লুম। তারপর একমাস চুপচাপ্। ঠিক একমাস পরে আবার ঘটল সেই ঘটনা। এবার কিন্তু প্রথমেই আমি অনেক বেশি সজাগ ছিলুম; ঘরের মধ্যে সেই ভাসমান মুণ্ডু দেখতে পেয়েই এক লাফে ঢুকলুম ভেতরে এবং মুহূর্তের মধ্যেই ভেতর থেকে দোরটা বন্ধ করে দিলুম। তারপর আলো জ্বাললুম। কিন্তু অশ্চর্য! তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঘরের মধ্যে আর কিছু পেলুম না; শুধু আমার কাপড়ের আলমারিটা আর ড্রেসিং টেবিলটা। ···আর সেদিন আমি ভয় পেলুম; জীবনে প্রথম ভয় পেলুম। আমার চামড়ার মধ্যেটা শিরশির করতে লাগলো; বেশ বুঝতে পারলুম আমার হার হয়েছে। আমার সমস্ত বুদ্ধি, আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা—সবকিছুর হার হয়েছে। আর আমার ভয় লাগল; আমার চামড়ার মধ্যেটা শিরশির করতে লাগল

—আর সমস্ত রাত আমার চোখে ঘুম এল না। শুধু ভয়ে নয়; একটা দারুণ অস্বস্তিতে। হেরে যাবার অস্বস্তি—কেন না, তার আগে জীবনে এমন কিছুতে বিশ্বাস করিনি যার স্বপক্ষে বুদ্ধির সাক্ষী নেই। সেই রাতে প্রথম বুঝলুম বুদ্ধির হার হয়েছে: বুঝলুম এবার থেকে নতুন করে সবকিছু শিখতে হবে। তাই পরদিন ভোর বেলায় লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে অতি-প্রিয় দর্শণ আর বিজ্ঞানের পুঁথির দিকে একদম মন গেল না। যেসব বইকে এতদিন অবহেলা করে ঠেলে রেখেছিলুম টান পড়ল সেগুলোর দিকেই—অধ্যাত্মবিদ্যা আর তন্ত্র সম্বন্ধে বইগুলো। আর অবাক হয়ে গেলুম; সেগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর পড়তে পড়তে দিন কতক পরে হঠাৎ একদিন বেরুলো ওই খাতাটা। খাতাটায় অনেক ভুলচুক চোখে পড়ল—কিন্তু তবুও সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল চোখের সামনে। বুঝলুম ঠিক একমাস অন্তর, প্রতি অমাবস্যার রাতে, কিসের মূর্তি আমি দেখতে পাই: ক্রমে যেন সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় নেশার মতন আমায় পেয়ে বসল; অমাবস্যা আসবার মুখে কী রকম অধৈর্য লাগতে লাগল। সূর্যপূজারীর সেই কাটা মুখ—"

অশোক হঠাৎ বাধা দিল, "সূর্যপূজারীর মুখ মনে করলেন কেমন করে?"

"আর কার মুখ মনে করতে পারি বলুন—অবশ্যই উল্টো ভাবে যে মুখ দূরে ভাসছে তাকে চিনতে পারা অসম্ভব; তাছাড়া

সূর্যপূজারীর চেহারা কেমন ছিল তারও উল্লেখ খাতাটায় কোথাও নেই। কিন্তু আর কার মুখ ওভাবে হাওয়ায় ভাসতে পারে বলুন?"

"তা ঠিক। তারপর কী হল?"

"তারপর কী হল তা নিশ্চয়ই আপনি ভবতোষবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি জানতে পেরেছেন। সমস্ত কথা আবার সুরুর থেকে গুছিয়ে বলবার মতো শক্তিও আমার নেই, কেবল যেটুকু জানেন না সেটুকু শুনতে পারেন।" প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন, তারপর আবার বলতে সুরু করলেন, "আপনাদের হয়ত খেয়াল নেই, কিন্তু আজ হল অমাবস্যা; এবং আজকের এই সূর্যাস্ত আমার জীবনে শেষ সূর্যাস্ত। আমায় আজ চলে যেতে হবে," প্রতাপচন্দ্রের গলা আবার আগেকার মতো দুর্বল হয়ে এলো। আবার তিনি আগেকার কথাগুলোই করুণভাবে বলে যেতে লাগলেন, "এই সহর এই সমুদ্র, এই সূর্য্যাস্ত—এদের যে আমি কী ভালবাসি তা কেমন করে বলব? অথচ চলে যেতে হবে যেতে হবে—আমার বংশের অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার দিন এসেছে আজ।"

প্রতাপচন্দ্রের চোখে কি রকম ফাঁকা দৃষ্টি ফুটে উঠলো। —মৃত্যুর মুখোমুখি অসহায় মানুষের চোখে যেরকম ফাঁকা দৃষ্টি ফুটে উঠে। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি বাইরের দিকে মুখ ফেরালেন। সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছে, তবুও লালচে আভা দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো।

"সূর্যদেব, আমায় ক্ষমা কোরো ; আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার প্রিয়তম পূজারীর……" প্রতাপচন্দ্রের পাতলা ঠোঁট তুটো কাঁপতে লাগল, গলা ভারি হয়ে এলো।

কুন্থ আর ভবতোষবাবু বিমূঢ়ের মতো শুনছিলেন প্রতাপ-চন্দ্রের শেষ প্রার্থনা। উভয়েরই মন একেবারে যেন নেতিয়ে পড়ছিল। অসম্ভব করুণ ; অসম্ভব অসহায়। অথচ কিছুই করবার নেই, এ লোককে সান্ত্বনা দেবার কি কোনো মানে হয় ? আর কী বলেই বা সান্ত্বনা দেওয়া যাবে ? তাই তুজনে স্তব্ধ ; পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ।

কুন্থর হুঁস হল। হঠাৎ হুঁস হল যে ঘরে অশোক নেই, "অশোক গেল কোথায় ?"

"তাইত। অশোক গেল কোথায় ?" ভবতোষবাবুও প্রায় চমকে উঠলেন।

কিন্তু কারুর পক্ষেই জোরে কথা বলা সম্ভব নয়। জীবনের যেন শেষ সান্ত্বনা উপভোগ করছেন প্রতাপচন্দ্র—প্রার্থনার সান্ত্বনা। একটানা চাপা গম্ভীর প্রার্থনায় বিঘ্ন আনা অসম্ভব।

অথচ, অশোক গেল কোথায় ? অশোক কি এই প্রেত-পুরীতে এসে উবে গেল না কি ? ভবতোষবাবুর বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠলো। একেবারে প্রেতপুরীতে দাঁড়িয়ে প্রেত সম্বন্ধে অমন নাস্তিকতা ঘোষণা করাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি ?

নবম পরিচ্ছেদ

দুর্দান্ত দরোয়ান

কিন্তু ভূত সম্বন্ধে যাদের রুচি নেই তাদেরও সম্বন্ধেও ভূতের রুচি থাকা সম্ভব নয়। তাই, এই প্রেতপুরীর মধ্যেই অশোককে আবিষ্কার করা গেল দিব্বি সুস্থ শরীরেই। সুস্থ, কিন্তু মেজাজটা রীতিমতো চড়া : প্রতাপচন্দ্রের দরোয়ানের সঙ্গে ধুমাধুম ঝগড়া লাগিয়েছে। কাছে গিয়ে কুনু আর ভবতোষবাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন কিন্তু বুঝতে পারলেন না কেন থেকে থেকে অশোক এমন খাপছাড়া কাণ্ড করে বসল। আসলে দোষটা ত তারই : কাউকে না বলে স্রেফ প্রতাপচন্দ্রের শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া—শুধু ঢুকে পড়া নয়, জিনিসপত্তর তছনছ করে উটকে পাটকে দেখা—এটা কোন মতেই ভদ্রতাসঙ্গত ব্যাপার নয়। প্রতাপচন্দ্রের দরোয়ান ত আর অশোককে চেনে না—সে কেমন করেই বা বুঝবে অশোক প্রতাপচন্দ্রের মঙ্গল উদ্দেশেই এই লণ্ডভণ্ড করতে এসেছে। ফলে সে এসে সঙ্গত ভাবেই বাধা দিতে গিয়েছিল, সে বলতে চেয়েছিল যে বাবুর ঘর যদি তল্লাস করতেই চাও তাহলে বাবুর মত নিয়ে এস! অশোক নাকি তার কথায় কানই দেয় নি। তারই পরিণাম এই ধুমাধুম ঝগড়া।

ভবতোষবাবুর মধ্যস্থতায় ঝগড়াটা থামলো। তিনি অশোককে বুঝিয়ে বললেন এই বিপদের বাড়িতে পা দিয়ে ছেলেমানুষি করা মোটেই উচিত নয়, ইত্যাদি। অশোকের রাগ তবু পড়ে না—কটমট করে সে দরোয়ানের দিকে তাকালো তারপর বলল প্রতাপচন্দ্রের ভালোর জন্যেই সে যখন ঘরটা পরীক্ষা করতে চায় তখন পরীক্ষা তাকে করতে দিতেই হবে। "দরোয়ানকে এ ঘর থেকে চলে যেতে বলুন"—অশোক যেন রাগে ফোঁস ফোঁস করছে।

শেষপর্যন্ত অশোকের জিদই জিৎল। শেষপর্যন্ত দরোয়ান ফোঁস ফোঁস করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

এদিকে সন্ধে হয়ে আসছিলো। আলো একেবারে কমে এসেছে। ভবতোষবাবু সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালাতে গেলেন। কিন্তু আলো জ্বলল না। অশোক একটু হাসল, বলল—"জানতুম।"

"জানতুম মানে?"

"মানে, শোবার ঘরের বড় আলোটা আজ খারাপ হয়ে যাবার কথা। আজ যে অমাবস্যার রাত!"

"তার মানে?"—ভবতোষবাবু বিহ্বল ভাবে বললেন।

অশোক তাঁর কথার জবাব দিল না। শোবার ঘর থেকে ড্রেসিং ঘরে যাবার যে দরজা তার ঠিক মাথার ওপর আর একটা আলো; সেটার দিকে সোজা এগিয়ে গিয়ে অশোক সুইচ

টিপল। জ্বলে উঠল আলো—একটা নীলচে আলো। অশোক আলোটার দিকে একটু চেয়ে রইল, তারপর ড্রেসিং ঘরের দোর ঠেলে খুলে ফেলল।

কুনু আর ভবতোষবাবু ঠিক কী করবেন ভেবে না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

ড্রেসিং-রুমের দোর খুলেই কিন্তু অশোক ভেতরে ঢুকল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ঘরের মধ্যে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল—পকেট থেকে রুমাল বের করে একবার নিজের মুখটা মুছল।

ড্রেসিং রুম-এর মধ্যে অন্ধকার। দরজার ওপরের নীলচে আলোটা শুধু অশোকের মুখের ওপর পড়েছে! অন্ধকার ড্রেসিং-রুম-এর মধ্যে কী খুঁজছে অশোক? কুনু আর ভবতোষবাবু এগিয়ে গেলেন তার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে অশোক ড্রেসিং-রুমএর মধ্যে ঢুকে ভেতরের আলো জ্বালিয়ে ফেলেছে।

ভেতরে দেখবার কিছুই নেই! শুধু একটা ড্রেসিং-টেবিল, সেকেলে ধরনের। একটা কাপড়ের আলমারি, সেকেলে ধরনের। আর কিছুই নয়।

কিন্তু সবই ত খাপছাড়া কাণ্ড অশোকের! হঠাৎ মাটির ওপর প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে খুব মনোযোগ সহকারে মাটিতে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে কী যেন খুঁজতে সুরু করল। প্রেত জিনিসটা যে সূক্ষ্ম এ কথা অবশ্য সবাই মানে—কিন্তু তাই বলে অমন ভাবে তাকে মাটিতে তল্লাস করতে হবে! ভবতোষ-

বাবু অশোকের ছেলেমানুষি দেখে মনে মনে না হেসে পারলেন না ; কিন্তু তারপরই অশোক যা সুরু করল তা দেখে হাসি আর মনে মনে চেপে রাখাও কঠিন হল ! লাইব্রেরি ঘরে প্রতাপচন্দ্র প্রলাপ বকছেন—তাঁর মাথার ঠিক নেই, তাঁর সম্পত্তি ফসকে যাবার জোগাড় ! কোথায় তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবে, তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে—আর তা নয়, ছোট্ট ড্রেসিং ঘরে ঢুকে এ কী ছেলেখেলা !

ড্রেসিং টেবিলের তলায় একটা নীচু জলচৌকি মতন ছিল, তার ওপর ড্রেসিং টেবিলটা বসানো। অশোক করল কি, পকেট থেকে একটা গজফিতে বের করে সেই জল চৌকিটা ঠিক কতখানি উঁচু তাই মাপতে সুরু করল ! তাজ্জব ব্যাপার !

"এত মাপজোপ কিসের ?"

কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। অশোক শুধু গম্ভীর ভাবে আপন মনে বলল, "হুঁ", তারপর কম্বুর দিকে চেয়ে, "ভবতোষদার চেয়ে প্রতাপচন্দ্র ঠিক কতটা লম্বা হবেন আন্দাজ করতে পারিস ?"

"তা প্রায় ইঞ্চি আষ্টেক হবেন বই কি।"

"ঠিক ইঞ্চি আষ্টেক ত ?"

কিন্তু কম্বুকে আর উত্তর দিতে হল না। ঘরের মধ্যে হৈ হৈ করতে করতে ঢুকল প্রতাপচন্দ্রের দুর্দান্ত দরোয়ান। বহুক্ষণ সে বাবুর শোবার ঘর ছেড়ে দিয়েছে, নেহাত উকিলবাবু বলেছেন

বলেই দিয়েছে। কিন্তু আর সে রাজি নয়। যদি শোবার ঘর তল্লাস করবারই দরকার থাকে তাহলে ঠিক মত ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে হবে, অন্তত বাবুর সম্মতি ত বটেই। তার বাবু অসুস্থ, সেই অসুস্থতার সুযোগে কেউ যে ঘরের মধ্যে যা খুসি তাই করবে............ইত্যাদি।

লোকটা দেখা গেল নেহাতই রগচটা প্রকৃতির। তার সঙ্গে হৈ-হল্লা নিশ্চয়ই করা যেত, ভবতোষবাবু ত প্রায় তাই ঠিকই করেছিলেন। স্পষ্ট রাগে তাঁর মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কুনু ভাবছিল অশোকেরও নিশ্চয়ই রোখ চেপে গিয়েছে, নিশ্চয়ই সেও জবরদস্তি সুরু করবে। ফলে হবে একটা কেলেঙ্কারী।

কিন্তু তা হল না। দেখা গেল, অশোকের মেজাজ এখন ভয়ানক মোলায়েম, ভয়ানক মিষ্টি। বরং সে উলটো সুরই গাইতে সুরু করল, "ঠিকই ত বলেছে বাপু! কর্তার অবর্তমানে অপরিচিত লোক শোবার ঘরে ঘটঘট করবে—এ আর কার সহ্য হয়? চলুন ভবতোষদা, আমাদের আবার আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে।"

এ আবার কী খাপছাড়া কথা? "হঠাৎ সকাল সকাল শোবার তাগিদ কেন?" ভবতোষবাবু প্রায় বিহ্বল ভাবেই বললেন।

"ওরে বাবা, আজ অমাবস্যার রাত! মনে নেই এ রাতে ভূত বেরুবার কথা," অশোক বলে চলল, "তাই, তাড়াতাড়ি বাড়ি

ফিরে সকাল সকাল শুয়ে পড়াই ভালো।" অশোকের গলায় কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ—"আর দরোয়ানজি, আজ রাতে খুব হুঁসিয়ার থেকো তোমরা। বাবুর শোবার ঘরটা বাঁচালেই ত হল না, বাবুকেও বাঁচাতে হবে। আজ রাতে যে ভূত বেরুবার ভয়—ভূতে যদি বাবুকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় তা হলে কিন্তু বড় আফশোষের কথা হবে!"

বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল দরোয়ান। ওরা তিনজন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

দশম পরিচ্ছেদ

জেলেপাড়া হয়ে

আকাশে আলো নেই। আজ চাঁদ উঠবে না। পথ অন্ধকার। থমথম করছে সবাইকার মন মেজাজ।

প্রতাপচন্দ্রের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় অশোক বলেছিল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার কথা। কিন্তু পথে বেরিয়ে দেখা গেল তার মতলব বদলে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেয়ে সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে খানিকটা হাওয়া খাওয়ার ব্যাপারেই তার আপাতত ঢের বেশি উৎসাহ। কিন্তু সমুদ্রের ধারে বেড়াবারও ত ভদ্র জায়গা এ সহরে বিরল নয়, হাওয়া যদি খেতেই হয় তা হলে সেদিকে যাওয়াই ত উচিত। কিন্তু, অশোক সোজা এগিয়ে চলল জেলে-পাড়ার দিকে। সেদিকটা অপেক্ষাকৃত নোংরা। নেহাত পাগল না হলে কেউ সেদিকে হাওয়া খেতে যায় না।

কিন্তু, মুহূর্তে মুহূর্তে অশোকের যেন মত বদল হচ্ছে। হাওয়া খেতে এলে ত হাওয়া খাওয়াই উচিত। তার বদল এ কী?

অদূরে, একটা নৌকো বালির ওপর উবুড় করে ফেলে দুজন জেলে সেটাকে মেরামত করছে দেখা গেল। দূর থেকে লণ্ঠনের

আলোয় তাদের শরীর আবছা দেখা যায়। অশোক হন হন করে এগিয়ে চলল তাদেরই দিকে। মনে হল হঠাৎ তাদের আবিষ্কার করতে পেরে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছে।

"কিহে কর্তা, নৌকোটা বুঝি খুব জখম হয়েছে?"—ইতি-মধ্যেই অশোক ভাঙা ভাঙা গোয়ানিজ ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে, অন্তত গোয়ানিজ জেলেদের সঙ্গে কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট ভালোই।

"তা জখম খুবই হয়েছিল।"

"মেরামত শেষ হতে লাগবে কতক্ষণ?"

"আর কতক্ষণ বাবু; সকাল থেকে ত এই নিয়েই পড়ে রয়েছি। মেরামত শেষ না করে আর জলস্পর্শ করছি না!"

"তা বেশ। তা বেশ। তা হলে জোয়ার আসবার আগেই মেরামত শেষ হয়ে যাবে। কি বল?"—যেন নৌকোটা মেরামত হবার ওপর অশোকের জীবন-মরণ নির্ভর করছে—এত উৎসাহ।

"তা নিশ্চয়ই হবে"—জেলে জোর দিয়েই বলল।

"তাহলে জোয়ার এলে এই নৌকো নিয়েই ঢেউ ভেঙে এগুতে পারবে—কি বলো?"

"তা যদি না পারি তাহলে যে মাঝিপাড়ার সর্দার নামে কলঙ্ক পড়বে।"

"বেশ, বেশ। কিন্তু একটা কথা," অশোক আমতা

আমতা করে বলল, "আজ রাতে আর না হয় মাছ না-ই ধরলে !"

এ আবার কোন ধরনের অনুরোধ ! কুনু আর ভবতোষবাবু দুজনেরই চোখ প্রায় গোলগোল !

"সে কি কথা বাবু ?"—জেলের সর্দার রীতিমতো ঘাবড়ে পড়েছে, "মাছ না ধরলে সংসার চলবে কেমন করে ?"

"আঃ হা, তার জন্যে আবার ভাবনা কি ?"—বলতে-বলতে অশোক পকেট থেকে একটা করকরে দশটাকার নতুন নোট বের করল, "সংসার চালাবার কাজটুকু এই দিয়েই হবে। কেমন ?"

একেবারে চারজোড়া বিহ্বল চোখ অশোকের ওপর। এ যেন রীতিমতো ভূতুড়ে ব্যাপার ! শেষ পর্যন্ত কি অশোককেই ভূতে পেল না কি !

সর্দার হলেও, জেলেটা যে বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছে সেটুকু বুঝতে পারা যায় তার হাবভাব দেখেই ! প্রথমটায় সে কিছুই ঠাহর করতে পারল না, তারপর যেন ব্যাপারটা ঠিকমতো বিশ্বাস করতে সাহস পেল না। নোটটা লণ্ঠনের আলোয় একবার তুলে ধরল, নোটটা যে জাল নয় বুঝতে পারল—চকচক করে উঠল তার দুটো চোখ—কিন্তু ওটা ট্যাঁকে পোরা ঠিক হবে কি না ঠাহর করতে না পেরে প্রায় জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"ঘাবড়াচ্ছো কেন ?"—অশোক খুব সহজ গলাতেই বলল,

"আসলে ওটুকু ত অগ্রিম। বাকি টাকা পরে পাবে—অনেক মোটা টাকা।"

"কিন্তু কী করতে হবে আমাদের?"

"বিশেষ কিছুই নয়। নৌকোটা নিয়ে ঠিক এই জায়গায় আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। রাতে সমুদ্রে জোয়ার এলে একটু বেড়াতে বেরুবো ভাবছি। তখন যদি ঠিকমতো বেড়িয়ে আনতে পারো তা'হলে দেখবে কী রকম মোটা বখশিশ পাবে!"

বিহ্বল জেলে দুজনকে পেছুনে ফেলে অশোক বাড়ি ফেরার পথ ধরল। তার পেছুনে ভবতোষবাবু। তার পেছুনে কুনু।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্তর্দ্ধান

বিমূঢ় জেলে দুজনকে পেছুনে ফেলে কুনু আর ভবতোষবাবুর সঙ্গে অশোক বাড়ি ফেরার পথ ধরল। জেলে দুজনের সঙ্গে কথা বলবার পর কে যেন তার মুখে চাবি বন্ধ করে দিয়েছে একেবারে একটিও কথা বলছে না।

ভবতোষবাবু চলতে চলতে বললেন "কী রকম বুঝছ, অশোক?"

"বুঝছি কপালে দুর্ভোগ আছে।"

"তার মানে?"

"দেখুনই না। অবশ্য আমার সমস্ত হিসেব ভুলও হতে পারে।"

"আঃ হা! খুলেই বলো না।"

"পরে বলব।"

"পরে মানে কখন?"

"মনে হচ্ছে কাল সকালে।"

এর পর আর কথা চলে না! তিনজন তাই চুপচাপ বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

বাড়ি ফিরে অশোক তার চামড়ার ব্যাগ নিয়ে বসল। তার

মধ্যে থেকে ছু-একটা জিনিস বের করে রাখল, সেদিন দোকান থেকে কেনা ছু-একটা ওষুধপত্তর ভরে নিল ব্যাগে। নিজের অটোমেটিক রিভলভারটা বের করে সাফ করল, কুন্থুকে বলল তারটাও সাফ করে রাখতে। রাতে দরকার পড়তে পারে। তারপর, তাজা কার্তুজের প্যাকেট খুলে ভরে নিল রিভলভারে। কুন্থুকেও ভরে নিতে বলল।

দিদি এসে বললেন, "খাবার দেওয়া হয়েছে।"

"যাচ্ছি। আচ্ছা দিদি, তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই ভালো থার্মোফ্লাস্ক্ আছে।"

"হুঁ। কী হবে?"

"খানিকটা খুব কড়া কফি ভরে রাখতে হবে। কফি যেন খুব বেশি কড়া হয় আর তাতে ছুধ বা চিনি দেওয়া না হয়।"

"কী আশ্চর্য! তুই ত কড়া কফি একদম খেতে পারিস নে! আর তাছাড়া ছুধচিনি একদম বারণ?"

"আমাদের জন্যে নয়। আমাদের জন্যে যদি বাড়তি ফ্লাস্ক্ থাকে তাহলে চা করে রাখলেই চলবে।"

"কিন্তু কফি কার জন্যে?"

"কাল সকালে বলব।"

তারপর আবার চুপচাপ। খাবার সময় অশোক একটিও কথা বলল না। খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর কুন্থুকে বলল,

"চটপট শুয়ে পড়। শোবার সময় বড় টর্চ আর রিভলভার মাথার বালিসের তলায় রাখিস।"

কুনু বেচারা ফাজলামি পর্যন্ত করতে পারছে না—অশোকের চেহারা এত গম্ভীর।

রাত কত হবে বোঝা যায় না। শুধু কালো আর জমাট বাঁধা অন্ধকার। অমাবস্যার রাত। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল কুনু—মনে হল অন্ধকারে কে যেন ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

কুনু হয়ত বিনা দ্বিধায় তার দিকে রিভলবার তুলে ধরত, কিন্তু বেচারা নিরস্ত্র হতে বাধ্য হল।

"ঘুম ভেঙে গেল?", স্পষ্ট অশোকের গলা, "আমার দিকে কিন্তু গুলি চালাস নি।"

"তুই? অশোক?"

"হুঁ। বাইরের দরজা বন্ধ দেখলুম! তাই!"

"কিন্তু গিয়েছিলি কোথায়?"

"সান্তা ক্রুস।"

"এই মাঝরাতে?"

"প্রতাপচন্দ্রের আজ রাতেই হারিয়ে যাবার কথা। দেখতে গিয়েছিলুম সত্যি হারিয়ে গিয়েছেন কি না!"

"কী দেখলি?"

"দেখলুম হারিয়ে গিয়েছেন। তাজ্জব ব্যাপার! দেউড়ির দরোয়ান না কি টেরই পায় নি!"

"তারপর?"

"দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের রওনা হতে হবে। সময় একদম নেই। তৈরি হয়ে নে। আমি ততক্ষণ ভবতোষদাকে ডেকে তুলছি।"

অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘুমচোখে একটা প্রকাণ্ড বর্মা চুরোট ধরালেন ভবতোষবাবু, দিদি তাঁর হাতে একটা ফ্লাস্ক দিলেন, "এটায় চা—" তারপর আর একটা ফ্লাস্ক কুনুর হাতে—"এটায় কফি।"

"কুনু, ফ্লাস্কটা খুব সাবধান! ভাঙলে সর্বনাশ হবে।"

"ঠিক আছে। ভাঙবে না।"

"টর্চ আর রিভলবার ভুলিস নি ত?"

"না। কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছি।"

"ঠিক আছে। আসি দিদি। তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। কাল সকাল হবে আমাদের ফিরে আসতে!"

তারপর ওরা যাত্রা করল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ। কটা বেজেছে আন্দাজ করা কারুর পক্ষেই কঠিন। অশোকের হাতঘড়িতে অবশ্য ফসফরাস জ্বলছে, কিন্তু সেদিকে ভালো করে দেখবার উৎসাহ কারুর নেই।

অন্ধকারের বুক চিরে অশোকের তীব্র টর্চ সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আর সকলে চলেছে চুপচাপ। কিন্তু কোন দিকে? কোন দিকে গেলে পাওয়া যাবে প্রতাপচন্দ্রকে? এ কথার জবাব কে দেবে? অশোক যে কথা একদম বলছে না! অশোক সোজা চলেছে সমুদ্রের দিকে।

সমুদ্রের দিকে কেন? কুনু আর ভবতোষবাবু কিছুই বুঝতে পারেন না। অনুগতের মতো অশোকের পেছুপেছু এগিয়ে চলেন শুধু।

চলতে চলতে অশোক হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। থমকে দাঁড়ালেন ভবতোষবাবু আর সেই সঙ্গে কুনুও।

কার যেন পায়ের শব্দ! কে যেন দৌড়ে আসছে তাদেরই দিকে। স্তব্ধ রাত্রির বুকে সে শব্দ স্পষ্ট আর ভারি।

কে আসছে? অশোক টর্চ ফেলল পেছন দিকে। কুনু কোমরে হাত দিল—রিভলবারের ওপরে হাত দিল!

অনেক দূরে টর্চের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল প্রতাপ-চন্দ্রের সেই দুর্দান্ত দরোয়ানকে! হাঁপাতে হাঁপাতে সে ছুটে আসছে। মুখে টর্চের আলো পড়ায় লোকটা থমকে দাঁড়াল, তারপর আন্দাজে উকিলবাবুদের অনুমান করতে পেরে চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়ান বাবু। জরুরি কথা আছে।"

ওরা তিনজন অপেক্ষা করে রইল। দরোয়ান দৌড় থামিয়ে আসতে আসতে এগিয়ে এল।

অশোক শুধু একবার অধৈর্যভাবে চাইল নিজের হাত ঘড়ির দিকে।

"ভয়ানক ব্যাপার চলেছে বাড়ির মধ্যে। আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন, আপনাদের ডাকতে এসেছি।"

"কী ব্যাপার?"

"প্রতাপচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে খবর ত আমিই প্রথম তোমাকে দিয়েছি।"

"হুঁ। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমি খোঁজ করতে সুরু করি। কিন্তু সমস্ত বাড়িময় এক অসম্ভব ঘটনা ঘটতে সুরু করেছে : একটা বাদুড়—তার গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে নরকের নীলচে আগুন—সমস্ত বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বাড়ির সর্বত্র নানান রকম শব্দ, নানান রকম অদ্ভুত আলো—জিনিসপত্র সমস্ত একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে একাএকা বাবুকে খোঁজবার সাহস হল না, অন্য সব চাকরবাকরও ভয়ে একেবারে ঘাবড়ে পড়েছে। তাই আপনাদের ডাকতে এসেছি। এখুনি আপনারা আসুন : সবাই মিলে বাবুকে খোঁজ করব।"

"তোমার বাবুকেই খুঁজতে বেরিয়েছি আমরাও।"

"কিন্তু এদিকে কোথায় চলেছেন?"

"জেলে পাড়ার দিকে।"

"বাবু কি ওই দিকে গিয়েছেন?"

"দেখা যাক কোন দিকে গিয়েছেন! আমরা যতক্ষণ না

ফিরি ততক্ষণ তুমি অন্য লোকজন নিয়ে বাড়িতেই থাকবে যাও।”

“না না, আমার সাহস হচ্ছে না। আপনারা আসুন।”

অশোক আবার হাতঘড়ির দিকে দেখল, তারপর সংক্ষেপে শুধু বলল, “এখন আমাদের সময় নেই।” তারপর হনহন করে আবার হাঁটতে স্নুরু করল।

বোঝা গেল ভূতের ভয়ে দরোয়ান এখন বাড়ি ফিরতে মোটেই রাজি নয়। তাই সেও পা চালাল ওদের দলের সঙ্গে।

টাকার লোভ বড় ভয়ানক লোভ। দশটাকার করকরে নোট হাতে পেয়ে এবং আরও অনেক টাকার আশ্বাস পেয়ে জেলে দুজন সমুদ্রতীরে তাদের নৌকো নিয়ে একেবারে প্রস্তুত। কিন্তু ওদের টাকা দিয়ে দাঁড় না করিয়ে রাখলেও হয়ত চলত, কেন না ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা জেলেদের নৌকো সমুদ্রে মাছ ধরা শেষ করে পাড়ে পৌঁছেছে। এ সময়টায় সমুদ্র তীরে নৌকোর বাস্তবিকই অভাব নেই।

নির্দিষ্ট নৌকোর মধ্যে অশোক প্রায় লাফিয়ে উঠল। তার শরীর ক্ষিপ্র চনমনে হয়ে উঠেছে। বারবার হাতঘড়ির দিকে দেখছে, মুহূর্তমাত্রও আর সময় নষ্ট করতে রাজি নয়।

“সময় বড় কম। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন আপনারা”—

অশোক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের সেনানায়ক হয়ে গিয়েছে। তার গলায় শুধু আদেশের স্বর।

ভবতোষবাবু উঠলেন। কুনু উঠল। দরোয়ানও উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু অশোক বাধা দিল।

"তুমি বাড়ি ফিরে যাও। যদি বাড়ি ঢুকতে সাহস না হয় পুলিশে খবর দেবে যাও।"

"আসতে চাচ্ছে আসুক না আমাদের সঙ্গে", ভবতোষবাবু বললেন, "ক্ষতি ত কিছু নেই, বরং দলে আর একজন থাকা ত ভালই।"

অশোক শুধু বলল, "উঁহুঁ।" তারপর জেলে দুজনকে আদেশ দিল, চটপট নৌকো নাবাতে।

স্তম্ভিত দরোয়ান চুপচাপ বালির ওপর দাঁড়িয়ে।

সমুদ্র জোয়ারে ফুলে উঠেছে।

নৌকো নাবানো সহজ কথা নয়। কিন্তু জেলেপাড়ার সর্দারের নামে অত সহজে কলঙ্ক পড়ে না—ঢেউ-এর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে ওরা দুজন অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকো ভাসিয়ে দিল।

বালির ওপর দাঁড়িয়ে দরোয়ান শুধু ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগল—দেখতে লাগল ছোট্ট নৌকোটা সমুদ্রের অন্ধকারে মিশিয়ে যাচ্ছে।

"যাবি কোন দিকে? ব্যাপার কি?" কুনু প্রশ্ন করল এতক্ষণ পরে।

কিন্তু সে ভাবনা অশোকের। তার কর্মপদ্ধতি অনেক আগে থাকতেই ছকা আছে : যেদিকে গেলে বোম্বাই সহর পাওয়া যাবে ঠিক তার উলটো দিক বরাবর যাবার নির্দেশ দিল জেলে দুজনকে।

জোয়ারের ঢেউয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার দরুণ পরিশ্রমের মধ্যেও জেলে দুজনের ঠোঁটে নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছিল হাসির রেখা, মাঝরাতে পাগলা বাবুর খেয়াল দেখে হাসি! কিন্তু অন্ধকারে সে হাসি কারুর চোখে পড়ল না।

কুনু অবাক হয়ে সমুদ্র দেখছিল। সমুদ্রের এরকম মূর্তি সে এর আগে কখনো দেখেনি। শুধু জমাট বাঁধা নিরেট একটা অন্ধকারের বন্যা—অন্ধকার আর শুধু অন্ধকার। দূরে, কিনারার দিকে, ফসফরাসের রূপোলি আগুন জ্বলছে—যেন একটা বিরাট দৈত্য, তার ঠোঁটের কোনায় নরকের নীলচে আগুন!

এ এক ভারি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! এই বিরাট কালো দৈত্যের বুক চিরে ছোট্ট নৌকোয় চড়ে এগিয়ে চলা—লোকালয়ের ঠিক উলটো দিকে, কোন দিকে শুধু অশোকই জানে। কোলের ওপর কফির ফ্লাস্ক্, কোমরে টর্চ আর রিভলভার, রাত কটা হবে জানা নেই। এতদিন পরে একটা সত্যি উত্তেজনার আস্বাদে কুনুর মন বেশ চনমন করে উঠেছে।

অশোক শুধু ঘড়ির দিকে অসহিষ্ণু ভাবে তাকাচ্ছে—

"জোরে চালাও। আরো জোরে—যত জোর পারো"—এ ছাড়া তার মুখে আর কোন কথা নেই !

হঠাৎ মনে হল সমুদ্রের ওপর ছপছপ করে আর একটা শব্দ। জলের ওপর দাঁড় টানার শব্দ। স্পষ্ট শব্দ। অশোক চমকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বলল, "চুরোটটা জলে ফেলে দিন···।" কিন্তু, ভবতোষবাবু চুরোটটা জলে ফেলে দেবার আগেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেল—দূর সমুদ্রের বুকে গর্জন করে উঠল একটা বন্দুক আর জেলের সর্দার আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ছোট্ট নৌকোয়। তারপর আর একটা, আরও একটা।

সমুদ্রের বুকের ওপর থেকে কে যেন পাগলের মতো এলোমেলো গুলি চালাচ্ছে !

এবার কিন্তু নৌকোর কোন আরোহী আহত হল না, আহত হল নৌকোটা। কয়েকটা গুলির আঘাতে নৌকোর একটা দিক যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেলো আর সেদিক দিয়ে হুড়হুড় করে নোনা জল ঢুকতে সুরু করল।

"কুমু, কফির ফ্লাস্ক ভবতোষদাকে দিয়ে হালটা ধর। ভবতোষদা, পা দিয়ে প্রাণপণে টিপে ধরুন নৌকোর ফুটো গুলো"—চীৎকার করে উঠল অশোক আর শুধু চীৎকার নয়, তার হাতের রিভলভারও গর্জন করে উঠল। অনেক দূরে অন্ধকারের দিকে সেও এলোমেলো গুলি চালাতে সুরু করেছে।

"টর্চ জ্বালাস নি, ওদের পক্ষে লক্ষ্য করবার সুবিধে হবে"— দূরে দাঁড় টানার শব্দ লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলি চালাচ্ছে আর পাগলের মত চীৎকার করছে—"হালটা মজবুত করে নৌকোর সঙ্গে বাঁধ তারপর দেখ সর্দারের জখমটা কোথায় হল, পারিস ত আমার ব্যাগ থেকে ফার্স্ট এড্ দে—"

আবার অশোকের হাতে গুলির শব্দ। এবার সমুদ্রের অন্ধকারে দূরে একটা আর্তনাদ।

আবার অশোকের পিস্তল!

কিন্তু এবার যেন জলযুদ্ধটা একতরফা হতে সুরু করল। কুনুও ক্ষেপে গিয়েছে। হাল বেঁধে মাঝিকে পরীক্ষা করে দেখল, তার আঘাত গুরুতর হয়নি, কাঁধের কাছে সামান্য চোট লেগেছে। ক্ষিপ্রহাতে কুনু তার কাঁধে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফেলল—"ভবতোষদা, ওকে একটু চা ঢেলে দিন"—বলতে-বলতে টলটলে নৌকোর মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াল কুনু আর দূরে দাঁড়ের শব্দ লক্ষ্য করে গর্জণ করে উঠল তার হাতের পিস্তলও।

কিন্তু ও তরফ থেকে আর জবাব নেই। বরং দাঁড়ের শব্দ ক্রমশ যেন সরে যাচ্ছে!

হো হো করে হেসে উঠল অশোক, "ভাবতেই পারে নি আমাদের কাছেও পিস্তল আছে আর আছে অজস্র কার্তুজ। ভাবতে পারে নি বলেই সামান্য কয়েকটা কার্তুজ নিয়ে ধমক

দিতে এসেছিল! কার্তুজ ফুরিয়েছে, এখন তাই রণে ভঙ্গ দিচ্ছে।"

"ফলো করবি না?"

"উঁহু। ফলো করবার সময় কোথায়?" বলতে বলতে অশোক একবার হাতঘড়ির দিকে চাইল, "কুনু, কত জোরে দাঁড় টানতে পারবি?"

কলকাতা রোইং ক্লাবের চাম্পিয়নসিপের মর্যাদা কুনুর মধ্যে যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, বুক ফুলিয়ে ধরল দাঁড় আর নৌকা ছুটে চলল প্রায় তীরবেগে। একজন মাঝি আর কুনু, তাদের মধ্যে পাল্লা চলেছে কার হাত ক্ষিপ্র!

ভবতোষবাবু পা দিয়ে প্রাণপণে নৌকোর গর্ত চেপে রয়েছেন, অশোক আহত মাঝিকে ওষুধ দিয়ে চাঙ্গা করে তুলছে আর দূরে মিলিয়ে গিয়েছে পলায়মান নৌকার শব্দ!

ওরা কারা? ভবতোষবাবু থমকে বসে ভাবছিলেন। ব্যাপারটা যেন কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। এই মাঝরাতে নৌকো নিয়ে অশোক কোথায় চলেছে? কারা বাধা দিতে চায় অশোককে? অশোক তাদের কথা আঁচই বা করল কেমন করে? বেরুবার আগেই যে আঁচ করেছিল তার প্রমাণ অশোক প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছে।

কুনু এমন পাকা মাঝির মতো দাঁড় টানতে শিখল কোথায়?

নৌকো হুড়হুড় করে এগিয়ে চলেছে। কোন দিকে চলেছে? কোনদিকে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে প্রতাপচন্দ্রের?

এই সব এলোমেলো প্রশ্নে ভবতোষবাবুর মাথার মধ্যেটা কী রকম যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল! চোখে কিছু দেখবার উপায় নেই!

অন্ধকার রাত!

অমাবস্যা!

সমুদ্রে আলো নেই!

হঠাৎ অশোকের হাতে জ্বলে উঠল তীব্র টর্চ। সমুদ্রের বুকের অন্ধকার চিরে কী যেন খুঁজতে সুরু করল আলোর তীব্র বর্শা। ক্রমে চঞ্চল আলো স্থির হয়ে দাঁড়াল একটা ছোট পাথরের দ্বীপের ওপর। সে পাথরের ওপর জীর্ণ প্রাসাদ, বহু শতাব্দীর ভারে ভেঙে গিয়েছে।

অন্ধকারে থমথম করছে সে প্রাসাদ।

"কুনু, ওইটে। ওই দিকে নৌকো ভেড়াতে হবে," অশোক বলল।

কিন্তু, এতক্ষণে ক্ষেপে উঠল মাঝি দুজন! প্রথমটায় বাবুকে মজাদার পাগল মনে হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশই তারা বুঝছে এ বাবু শয়তানের অনুচর ছাড়া কেউ নয়। গোলাগুলি না হয় বোঝা যায়। আহত হয়েছে বলেও সর্দার ততখানি ঘাবড়ে পড়েনি। কিন্তু এই মাঝরাতে—ঘোর অমাবস্যার রাতে—ওই

নামকরা ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িতে যাওয়া? ও বাড়ির ইতিহাস কে না জানে, কে না জানে প্রেতের উপদ্রবে ও বাড়ির মালিক নিজে সেখানে টিঁকতে পারে নি। ওই বাড়িই ত উদয়চন্দ্রের আদিম বাড়ি, ওই বাড়িতে টেঁকতে পারেন নি বলেই ত তিনি নিজে নতুন বাড়ি করেছিলেন সান্তা ক্রুস্-এ।

এই মাঝরাতে, গভীর অমাবস্যার রাতে, ওই বাড়ির গায়ে নৌকো লাগানো? মাঝিরা কিছুতে রাজি নয়, জ্ঞান থাকতে নয়।

কিন্তু নৌকোর দাঁড় কুন্নুর হাতে। অশোক এক হাতে ধরল হাল আর তার আর এক হাতে দুর্দান্ত আগ্নেয়াস্ত্র! নিরুপায় মাঝি দুজন শুধু গজরাতে লাগল—তা ছাড়া আর তারা কী করতে পারে? এমনটা হবে জানলে টাকার লোভে কি তারা কখনো ভুলত?

"ভবতোষদা, কফির ফ্লাস্কটা সামনে রাখবেন। টর্চটা ধরুন বাড়িটার ওপর", অশোক বলল। তার গলায় কঠোর আদেশ শুধু।

"জোয়ারের জলে বাড়ির চারদিক ত ভেসে গিয়েছে! নৌকো ভেড়ানো যাবে না", কুন্নু বলল। মরীয়ার মতো সে দাঁড় টেনে চলেছে।

"এই বাড়ির নীচে কোথাও একটা গোপন সুড়ঙ্গপথ আছে," অশোক বলে চলল, "সেই পথ দিয়েই নাকি বহুদিন আগে

প্রতাপচন্দ্রের পূর্বপুরুষরা জলদস্যুর ব্যবসা চালাতেন। সেই সুড়ঙ্গপথটা খুঁজে বের করতে হবে।"

হাল অশোকের হাতে। ভবতোষবাবুর টর্চ অনুসরণ করে সে বাড়িটার চারপাশে নৌকো ঘোরাতে লাগল।

অমঙ্গলের আশঙ্কায় দুজন মাঝি জড়সড় হয়ে বসে।

শেষ পর্যন্ত সুড়ঙ্গপথ বেরুল। মাঝি দুজন ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগল।

কুন্নু একা দাঁড় টানছে। অশোক হাল ধরে। নৌকো ঢুকল অন্ধকার সুড়ঙ্গর মধ্যে।

"সাবধান কুন্নু, পাথরে না চোট লাগে", সুড়ঙ্গের মধ্যে অশোকের গলা গুমগুম করছে—"ভবতোষদা, দেয়াল আর ছাদের দিকে টর্চ ঘোরান, নৌকো বাঁধবার আংঠা পাওয়া যাবে।"

আংঠা বেরুল শেষ পর্যন্ত। মজবুত করে আংঠার সঙ্গে নৌকো বেঁধে ফেলল কুন্নু।

কুন্নু আর সেই আলস্যপ্রিয় যুবক নয়। তার শরীরের প্রত্যেকটি পেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এক হাঁটু জল। তার মধ্যেই নেবে পড়ল অশোক, কুন্নু, এমন কি ভবতোষবাবুও। সর্বনাশের ভয়ে মাঝি দুজন শুধু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, নাবতে একেবারেই রাজি হল না।

কিন্তু ওদের দিকে নজর দেবার মতো সময় অশোকের মোটেই নেই! জল পেরিয়ে সুড়ঙ্গর ভাঙা সিঁড়ি, টর্চের

আলোয় পথ খুঁজতে খুঁজতে সেই সিঁড়ি ভেঙ্গে সে ওপরের দিকে উঠে চলল।

তার পেছু পেছু কুনু।

তার পেছু পেছু ভবতোষবাবু।

অশোক সাবধানে এগুচ্ছে আর টর্চের আলো ফেলে কী যেন খুঁজছে।

তারপর হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। তার হাতে টর্চের চঞ্চল আলো স্থির হয়ে গেল।

সে আলোর মুখে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রয়েছে একটি মনুষ্য-মূর্তি! দীর্ঘ ক্ষীণ শরীর!

"প্রতাপচন্দ্র!" উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন ভবতোষবাবু।

কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করে নষ্ট করবার মতো সময় তখন অশোকেরও নেই, কুনুরও নেই—দুজনে ঝুঁকে পড়েছে অচৈতন্য দেহের ওপর।

ব্যাগ্র ভাবে অশোক নাড়ীটা পরীক্ষা করল, চোখের কোল টেনে টর্চ দিয়ে দেখল, তারপর স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বলল, "যাক দেরি হলেও খুব বেশি দেরি হয় নি। এখনো সময় আছে।" বলতে বলতে অশোক আর কুনু প্রতাপচন্দ্রের দেহটা তুলে নিল।

"ভবতোষদা, আলো দেখিয়ে ওপরের দিকে চলুন, ওপরে বড় ঘর পাওয়া যাবে।"

ডাঙাচোরা হলেও হাত-পা মেলে কাজ করবার মতো জায়গা ওপরে প্রচুর। কুনুর আর অশোকের যেন দম ফেলবার সময় নেই। ব্যাগ খুলে অশোক পাকা ডাক্তারি সুরু করল যেন। ওষুধ খাইয়ে প্রতাপচন্দ্রকে হুড়হুড় করে বমি করাল, তারপর একটা ইনজেকশন দিল, মুখে কালো কড়া কফি ঢেলে দিল। এই রকম কত কি।

টর্চ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভবতোষবাবু শুধু বললেন, "ব্যাপারটা কী ?"

"কিছু নয়। সামলে যাবেন। অতিরিক্ত পরিমাণ আফিম পেটে পড়েছিল, তাই।"

প্রতাপচন্দ্র যখন চোখ খুললেন তখন ভোর হয়ে গিয়েছে, আকাশে সূর্য উঠেছে! সমুদ্রে জোয়ার নেবে গিয়ে জেগে উঠেছে পাথর—এই ভাঙা প্রাসাদের সঙ্গে জমির যোগাযোগ ফুটে উঠেছে।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না," ক্ষীণ গলায় বললেন প্রতাপচন্দ্র, "এ আমি কোথায় এসেছি ?"

আপনাদেরই পুরনো বাড়িতে," অশোক বলল, "কিন্তু আগে সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর সব বোঝবার চেষ্টা করবেন।" তারপর ভবতোষবাবুর দিকে ফিরে, "ভবতোষদা, আপনি ডাক্তার আর স্ট্রেচারের বন্দোবস্ত করবেন যান। মাঝি দুজন নিশ্চয়ই ভয়ে পালিয়েছে, কিন্তু স্থলপথেই এখন যেতে পারবেন আশাকরি।"

"তুমি আর কুনু তা হলে এখন এখানে থাকবে ?"

"হুঁ। চায়ের ফ্লাস্কেএ চা আছে। আপাতত তার ওপর নির্ভর করেই আমরা রইলুম।"

ভবতোষবাবু ভাঙা বাড়ির এবড়ো-খেবড়ো পথ হাৎড়ে বাইরে চলে গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যবনিকা পতন

বিকেলে উদয়ভিলায় প্রতাপচন্দ্রের শোবার ঘরে ক্ষীণ দুর্বল শরীরে প্রতাপচন্দ্র শুয়ে আছেন। ডাক্তার-নার্স-এ ঘর ভরতি। ঘরে ঢুকলো অশোক আর কুনু আর ভবতোষবাবু।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না, অশোকবাবু", প্রতাপচন্দ্র বললেন।

"বুঝিয়ে বলছি শুনুন।" সুরু করল অশোক, "প্রথম কথা হচ্ছে, খাতাটায় ঝুটো দাগ দেখে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল এর পেছুনে কোনো মানুষের মগজ রয়েছে। প্রেতের নয়। মানুষের মগজ যদি থাকে তা হলে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকা ত দরকার। উদ্দেশ্য কী হতে পারে? আপনাকে অলৌকিক ব্যাপারে শুধু বিশ্বাসী করে তোলাই নয়, অলৌকিক অভিশাপের অংশিদার করে তোলাও। কিন্তু আপনার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। তাই স্বচক্ষে দেখাবার বন্দোবস্ত হল।".

"সেটা কেমন করে হল?"

"বলছি শুনুন। আপনার ড্রেসিং টেবিলের ডানদিককার আয়নাটার কাঁচটা বাঁকা, যেমন অনেক দাড়ি কামাবার আয়নায় থাকে, অর্থাৎ তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে উল্টো ভাবে এবং ড্রেসিং

রুমের ঠিক দোরের ওপর যে আলো সেটা এমন ভাবে বসানো যে সুইচের সামনে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালালে শুধু মুখটার ওপরই আলো পড়ে। সেই মুখের প্রতিবিম্ব আয়নায় উলটো ভাবে দেখে আপনি সূর্যপূজারীর মুখ বলে মনে করেছিলেন।"

"কিন্তু তা হলে প্রথম দিন থেকেই ত দেখতে পেতুম! শুধু অমাবস্যার রাত কেন?"

"কারণ, আপনি বেশ লম্বা আছেন এবং ড্রেসিং টেবিলটা বেঁটে। তাই অমাবস্যার সন্ধ্যাবেলায় ড্রেসিং টেবিলটাকে জল-চৌকির ওপর বসানো হত। আপনি লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু আমি জলচৌকিটাকে মেপে দেখেছি, ঠিক আপনার মাথার মাপ হিসেব করে সেটা তৈরি। ঘরের মেঝেতেও ধূলোর দাগ ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে বোঝা যায় জলচৌকিটা বরাবর ড্রেসিং টেবিল ঘাড়ে করে দাঁড়ায় না। মাসে একদিন করে দাঁড়ায় মাত্র।"

"কিন্তু সেই নীলচে আলো-ভরা বাদুড়?"

"সেটা সম্ভবত সত্যিই বাদুড়, তবে ফসফরাসে চুবিয়ে নেওয়া বোধ হয়। নিশ্চয়ই আপনার অনুপস্থিতিতে ঘরে বেচারাকে বন্দী করা হত, দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে বেরিয়ে যেত।"

"কিন্তু কে? কে এমন চক্রান্ত করেছিল?"—ভবতোষবাবু অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন।

"বলছি। সে যাই হোক, তার বুদ্ধির তারিফ না করে পারি নে। কী নিখুঁত ভাবে সব প্ল্যান করেছে বলুন? প্রথমত প্রতাপচন্দ্রকে স্বচক্ষে প্রেত প্রদর্শন করানো; তারপর বংশ ইতিহাসের সঙ্গে এই প্রেতকে জড়িয়ে ফেলে তাঁর মাথায় ঢোকানো যে অতীত অভিশাপের দেনা শোধ না করে উপায় নেই। খাতায় আফিম ধরার কথাটাও কতখানি হিসেব করে লেখা—লেখক জানতেন এত দিক থেকে প্রতাপচন্দ্রের মনকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে যে তাঁর পক্ষেও এই আফিম না ধরে উপায় নেই। এবং শেষ পর্যন্ত একদিন স্বপ্নচালিতের মতো সেই সুড়ঙ্গে ঢুকে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা প্রতাপচন্দ্রকে করতেই হবে—কেননা দিনের পর দিন তাঁর মন এমন দুর্বল হয়ে পড়বে যে তখন খাতার হিসেব থেকে এক পা এদিক ওদিক হওয়া আর সম্ভব নয়। আমি কাল প্রতাপচন্দ্রের কথাবার্তা থেকে বুঝেছিলুম সেই সাংঘাতিক রাত উপস্থিত হয়েছে; পাছে জোয়ারের জন্যে পুরনো বাড়িতে ঢোকা সম্ভব না হয় তাই নৌকোর বন্দোবস্তও করেছিলুম।"

"সব ত বুঝলুম, কিন্তু আসামীটা কে বলছ না কেন?" অত্যন্ত অধীরভাবে বলে উঠলেন ভবতোষবাবু!

"তাও বলে দিতে হবে? সবই ত বললুম। আপনারা বুঝে নিন।"

"কী আশ্চর্য! নামটা না বললে বুঝব কেমন করে?"

"কেন? প্রতাপচন্দ্র আত্মহত্যা করলে বা অন্তত পাগল হয়ে গেলে কার লাভ? কে সম্পত্তি পাবে?"

"সম্পত্তি পাবার যে লোক সে যে সম্পত্তি চায় না! কেননা প্রতাপচন্দ্রের একমাত্র আত্মীয় ধীরবিক্রম, এবং সম্পত্তি পাবার চেয়ে সম্পত্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে অনেক বেশি পাগল।"

"কিন্তু সেই-ই!" অশোক বলল।

অশোকের কথা যেন ঘরে বজ্রপাত করল।

"অসম্ভব!" একসঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের ও ভবতোষবাবুর উত্তেজিত চীৎকার।

অশোক শুধু মৃদু হাসতে লাগলো।—"সম্পত্তির যখন আর কোন ওয়ারিশ নেই, তখন এ চক্রান্তের পেছুনে আর কারুর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সময় পেলে ধীরবিক্রমবাবুকে আমি নিশ্চয়ই বন্দী করতে পারতুম। অনেকবার তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলুম। কিন্তু নেহাত সময় ছিল না হাতে, তাই। এবাড়িতেই দরোয়ান সেজে তিনি থাকতেন—তাই আমি আপনার শোবার ঘর পরীক্ষা করবার সময় দরোয়ানজী অমন শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, তাই আপনি নিরুদ্দেশ হবার পর পাছে আপনাকে জীবিত অবস্থায় খুঁজে পাই এই ভয়ে দরোয়ানজী আমাদের এ বাড়িতে টেনে আনতে চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার চাল বুঝেতে পেরে দ্বিতীয় নৌকো ভাসিয়ে

আমাদের পেছু নেন—ভবতোষদার চুরোটের আগুন অনুসরণ করে পেছু নেন—এমন কি গুলি চালান!”

এ একেবারে আজগুবি কথা! অশোক যত ধুরন্ধর বুদ্ধিমানই হোক না কেন, তাই বলে যা খুশি বলবে? অথচ এইমাত্র অমন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে; কিছু বলাও যায় না!

কিন্তু বলতে আর হল না কাউকে। বাড়ির ভৃত্য একটা চিঠি নিয়ে উপস্থিত, দেউড়ির দরোয়ান নাকি খানিক আগে বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় চিঠিটা ভৃত্যের হাতে দিয়ে গিয়েছে বাবুকে দেবার জন্যে।

প্রতাপচন্দ্র চিঠিটা পড়ে চললেন!

“প্রতাপ, আমি চল্লুম দেশ ছেড়ে; আমার জাহাজ ছাড়বে আধ ঘণ্টা পরে। ফলে আমায় ধরতে পারবে না। চলে যাচ্ছি; কেননা আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল। দেখলুম বাঙালী গোয়েন্দা আমার চেয়ে চালাক। তবু তাঁকে ধন্যবাদ জানাই; কেননা সম্পত্তির লোভে ভাইকে খুন করবার যে চক্রান্ত করে-ছিলুম সত্যিই তাতে মনে মনে একটা দারুণ বিবেক-দংশনও ভোগ করছিলুম। অশোকবাবু আমায় অন্তত তার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, সেজন্যে কৃতজ্ঞ। আমায় আর বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, তবু একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি: প্রথম দিকে সত্যিই আমার এ অভিসন্ধি ছিল না। তোমার ওই বিরাট

সম্পত্তির স্বাদ না পেলে সম্পত্তির লোভই আমার হয়ত হত না। দিব্বি ছিলুম লক্ষ্ণৌতে খেলাধুলো নিয়ে।

"যাক ওসব কথা! তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে লাভ নেই; কেননা, জানি তোমার কাছ থেকে ক্ষমা পাবার যোগ্য নই। তবে, বিদেশ যাবার পথখরচার জন্যে যে সামান্য টাকা তোমার বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছি সেটুকু আমার রোজগারের টাকাই: এতদিন ধরে তোমার দেউড়িতে দরোয়ান সেজে পাহারা দিয়েছি, তারই জমানো মাইনে।

ক্ষমা তুমি করতে পারবে না, তবু আবার ক্ষমা চাইছি।

তোমার—ধীরবিক্রম।"

চিঠির শেষটুকু পড়তে পড়তে প্রতাপচন্দ্রের গলা ভিজে এল।

ফস করে প্রশ্ন করল অশোক, "আঃহা, ঠিকানাটা দিয়ে যান নি, না?"

"ফেরারী আসামী কি ঠিকানা রেখে যায়?"—ভবতোষবাবু একটু বিদ্রূপ মাখিয়েই প্রশ্নটা করিলেন!

"নাঃ, ঠিকানাটা দিয়ে গেলে একটা ভালো উপদেশ লিখে পাঠাতে পারতুম: ভূতের গল্প ফাঁদতে তিনি যখন অমন ওস্তাদ তখন বিদেশ গিয়ে উনি যদি শুধু ভূতুড়ে গল্প লেখেন তা হলে, বলা যায় না, প্রতাপচন্দ্রের এখানে যা টাকা আছে সেটুকু হয়ত তিনি অনায়াসেই অল্পদিনে উপার্যন করতে পারবেন। ওদের দেশে শুনেছি লিখে বেশ দু পয়সা রোজগার করা যায়!"

★

এখানে মৃত্যুর হাওয়া

প্রবোধ ঘোষ

শিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্রী; রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র ও খেলোয়াড় এবং বিভূতি ডাক্তার ও ডিটেকটিভ। এদের তিনজনের নামের প্রথম আক্ষর নিয়ে 'শিবির' ক্লাবের গোড়া পত্তন। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য হোলো গোয়েন্দাগিরি করা, রহস্য ও রোমাঞ্চের সন্ধানে ঘোরা। 'এখানে মৃত্যুর হাওয়া' তাদের প্রথম অভিযানের কাহিনী। একদিকে এই তিনজন ধুরন্ধর—অন্যদিকে কাফ্রু, রোহেম, যোসেফ, ওয়াং-ফু। পটভূমিকা সুন্দরবন অঞ্চলের এক বিরাট পুরনো রাজবাড়ি। রহস্যের পর রহস্য পাতায়-পাতায় ঘনিয়ে উঠেছে। প্রতিপদেই মৃত্যুর হাওয়া যেন গায়ে এসে লাগছে। এতো ভালো রোমাঞ্চকর উপন্যাস এবছর আর একটিও বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় বই

শ্বেত-চক্র

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৩৫২ সালে 'রংমশাল' মাসিক পত্রে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই উপন্যাস ছেলেবুড়োর মন ভুলিয়েছে। তার প্রধান প্রমাণ রাশিরাশি প্রশংসা-পত্র। 'কালপুরুষ সিরিজে'র অন্তর্গত করার সময় এই উপন্যাসটি অনেক বড় করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ফলে রংমশালের পাতায় প্রথম এই উপন্যাস যারা পড়েছো তারাও আবার একটি নতুন উপন্যাস পড়বার আনন্দ পাবে। এই বই-এর প্রধান চরিত্র সঞ্জীব আর ধনঞ্জয় কবিরাজ আর এক অদৃশ্য শত্রু যে হত্যা করার আগে একটি করে শ্বেত-চক্র পাঠায়। পাতার পর পাতায় এই রহস্য ক্রমাগত ঘনিয়ে এসেছে। যতক্ষণ না শেষ লাইনটি পড়বে ততক্ষণ সুস্থিরে নিশ্বেস ফেলতে পারবে না।

যারা 'রংমশাল' পত্রিকার গ্রাহক তারা এই সিরিজের বই বিনা ডাক-ব্যায়ে পাবে। গ্রাহক হবার নিয়মাবলীর জন্যে আজকেই এই ঠিকানায় চিঠি লেখো: সম্পাদক রংমশাল: ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলিকাতা।

ঘনশ্যামের ঘোড়া

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বোপদেব আর ইহ জগতে নেই—এই ছোট্ট খবরের জন্যে কেন চেয়ার উল্টুলো, টেবিল ভাঙলো, খবরের কাগজ টুকরো-টুকরো হোলো যদি জানতে চাও আজই তাহলে 'ঘনশ্যামের ঘোড়া' পড়। এ ছাড়াও আছে আরো পাঁচটি মজার গল্প। আছে বিখ্যাত পি. সি. এল এর আঁকা ছবি। আছে নানা রঙের চমক-লাগানো প্রচ্ছদপট। দাম ১॥০; 'রংমশালের' গ্রাহকরা পাবে ১।০ আনায়। ডাকমাশুল দু' আনা।

ছাতুবাবুর ছাতা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কে ছাতুবাবু? কী রকম তাঁর হিসেব? তাঁকে তোমরা চেনো? এই সব মজাদার খবর জানতে হলে আজই এক কপি 'ছাতুবাবুর ছাতা' কিনে পড়। আটটি মজার মজার গল্প এতে আছে। অনেক মজার ছবি। সুন্দর নানা রঙের প্রচ্ছদপট। দাম ১।০, 'রংমশালে'র গ্রাহকরা পাবে ১৲ টাকায়। ডাকমাশুল দু' আনা।

প্রাপ্তিস্থান

রংমশাল আপিস

কিংবা যে-কোনো বিখ্যাত বই-এর দোকান